Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের জীবনে কোরআনের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ কামরুজ্জামান খান

রোলঃ 216010055

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের জীবনে কোরআনের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ কামরুজ্জামান খান

রোলঃ 216010055

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মুমিনের জীবনে কোরআনের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোঃ কামরুজ্জামান খান। আইডিঃ 216010055 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "মুমিনের জীবনে কোরআনের ভূমিকা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জনাব মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

মোঃ কামরুজ্জামান খান

আইডিঃ 216010055

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকা ৬

মুমিনের পরিচয়... ৬

কোরআনে বর্ণিত মুমিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৭

মুমিনের জীবনে কোরআনের প্রভাব.. ৯

কোরআন ব্যতীত মুমিনের জীবন অর্থহীন.. ১০

মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী ১৪

দৈনন্দিন জীবনে করণীয় বিষয়সমূহ... ১৫

দৈনন্দিন জীবনে মুমিনের বর্জনীয় বিষয়সমূহ.. ৩১

কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত আদি, বংশানুক্রমিক জাহিলি রসম ও রেওয়াজ অনুসরণ না করাঃ...... ৩২

মৃত্যুর সময় যেসব লক্ষণ মুমিনের জন্য সুসংবাদ ৪৫

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই রাব্বে কারীমের যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নূর আল্লাহ তাঁর বানী আল-কোরআনে রেখেছেন। আর এই জন্যই কোরআন বিশ্বের সবথেকে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। যে ব্যক্তি কোরআনকে যত বেশি ধারণ করবে, সে তত বেশি আলো লাভ করবে। কোরআনের প্রভাব তাঁর ভাষা, ভাবগাম্ভীর্য ও অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্যের কারনে। কোরআনের এই অন্তর্নিহিত ভাষাশৈলী ও রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন, "যদি আমি এই কোরআন পর্বতের উপর নাযির করতাম, তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখতে। আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে।"(সূরা হাশর, আয়াত : ২১)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষরাই আল্লাহর বাণীর ধারক হয়ে থাকে। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'এরাই তারা নবীদের মধ্যে যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আদম এর বংশ থেকে এবং যাদের আমি নূহের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম এবং ইবরাহিম ও ইসমাইল এর বংশোদ্ভূত ও যাদের আমি পথনির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম; তাদের কাছে দয়াময়ের আয়াত আবৃতি করা হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত কান্না করতে করতে। সূরা মারিয়াম, আয়াত : ৫৮)

মুমিনের পরিচয়

মুমিন একটি আরবি শব্দ, যা মূলত আরবি ইমান শব্দটি থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ "বিশ্বাসী" এবং এর দ্বারা একজন কঠোরভাবে অনুগত মুসলিমকে বোঝায়, যে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ইসলামকে নিজের অভ্যন্তরের এবং বাহিরের সকল কর্মকান্ডে ধারন করে এবং আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। নারীদের ক্ষেত্রে মুমিনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইমান অর্থ বিশ্বাস আর মুমিন মানে বিশ্বাসী। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসীকে মুমিন বলা হয়। ইসলাম মানে আনুগত্য, মুসলিম অর্থ অনুগত ব্যক্তি, যিনি ইমানের সঙ্গে নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত এবং আল্লাহ ও রসুল এর যাবতীয় আদেশ-নিষেদ মেনে চলেন। মুমিন ও মুসলিম জন্মগত ও বংশীয় পরিচয় নয়, বিশ্বাস ও কর্মে তা অর্জন করতে হয়।

ইমান, ইয়াকিন, ইখলাস, তাকওয়া, তাজকিয়া ও ইহসান অর্জনের মাধ্যমে ইসলাম বা আত্মসমর্পণ সফল মুমিনের গুণাবলি। আল-কোরআনের শুরুতেই বিবৃতি হয়েছে,'আলিফ লাম মিম! এই সেই মহাগ্রন্থ, যাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, এটি মুত্তাকীনদের জন্য পথনির্দেশ। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, সালাত কায়েম করে,আমি তাদের যে রিজিক-দৌলত দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। আর যারা বিশ্বাস করে তারা আপনার প্রতি, অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি আর যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে এবং তারা পরকালের প্রতি একিন তথা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এরা এদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের ওপরে রয়েছে এবং এরাই সফলকাম।' (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ১-৫)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন মাজীদে তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন, দয়াময় আল্লাহর ঈশ্বকৃত বান্দা তারাই যারা পৃতিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের যখন অজ্ঞ লোকে মূর্খতাসুলভ সম্বোধন করে তখনও তারা সালাম ও শান্তির বাণী বলে। তারা রাত্রি যাপন করে তাদের

প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সেজদায় অবনত হয়ে ও দাড়িয়ে ইবাদাত-বন্দেগির মাধ্যমে এবং তারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নাম এর শাস্তি বিদূরিত করুন; উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ! নিশ্চয় তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসেবে নিকৃষ্ট!" আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তারা মধ্যপন্থায় থাকে। তারা আল্লাহ সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ বা মাবূদকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেদ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।

বস্তুত যারা এসব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীনাবস্থায় স্থিত হবে। তবে তারা নয়, যারা তওবা করে ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ এদের পাপ পূণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যারা তওবা করে ও সৎকর্ম করে, তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সহিত তা উপেক্ষা করে চলে। আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করে না এবং যারা প্রার্থনা করে,"হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী হবে এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন।" এদের প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ স্থান, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সম্ভাষণ সহকারে; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও আবাসন হিসেবে তা কতই উৎকৃষ্ট!' (সূরা ফুরকান, আয়াত: ৬৩-৭৬)

কোরআনে বর্ণিত মুমিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইমান যাদের আছে, তাদের মুমিন বলে। যারা ইসলামে প্রবিষ্ট হয়েছেন, তাদের ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে ইমান রাখা অপরিহার্য। মুমিনের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, 'মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। অতঃপর তাতে কোনো ধরনের সন্দেহ পোষণ করেনি। আর তাদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো সত্যনিষ্ঠ।' (সূরা হুজরাত, আয়াত: ১৫)

সূরা মুমিনুনের শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনের এমনই কিছু বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মুমিনরা, যারা তাদের নামাজে আন্তরিকভাবে বিনীত।

যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত সম্পাদনকারী। যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে; নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সবার থেকে। কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।

তবে কেউ এছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এবং যারা নিজেদের নামাজের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরাই হলো ওয়ারিশ, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মিরাস লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।' (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১-১১)

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা মুমিনের সাতটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন :

প্রথম গুণ: যারা তাদের নামাজে আন্তরিকভাবে বিনীত। প্রথম বৈশিষ্ট্য হরো, মুমিন নামাজে 'খুশু' অবলম্বন করে। নামাজ ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। মুমিনের চক্ষু-শীতলতা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনেক বড় একটি মাধ্যম। রাসুল (স.) ইরশাদ করেন, 'নামাজে রাখা হয়েছে আমার চোখের শীতলতা।'(সুনানে নাসায়ী, হাদিস : ৩৯৪০)

দ্বিতীয় গুণ: যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। মুমিনের বিশেষ একটি গুণ হলো সে অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বেচে থাকে। হাদিস শরিফে এসেছে, 'সুন্দর মুসলিম হওয়ার একটি নিদর্শন হলো, অর্থহীন কাজ ত্যাগ করা।' (তিরমিজি, হাদিস ২৩১৮)

অহেতুক বিষয় থেকে বেঁচে থাকার সর্বপ্রথম ক্ষেত্র হলো, সব ধরনের গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা। তেমনি এমন কথা, কাজ, লেখা ও চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা, যাতে না দ্বীনি কোনো ফায়দা আছে, না দুনিয়াবি কোনো ফায়দা আছে।

তৃতীয় গুণ: যারা যাকাত সম্পাদনকারী। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন যাকাত আদায় করে। যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান। হাদিসের ভাষায় ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। তাই ইমানের অপরিহার্য দাবি, যাকাত ফরজ হলে তা আদায় করা। যাকাত আদায় না করার ব্যাপারে কোরআন ও হাদিসে কঠিন হুঁশিয়ারি এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের যন্ত্রনাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও। যেদিন সে ধন-সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, পাজর ও পিঠে দঠস দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে গেন সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে, তা মজা করে ভোগ করো।' (সূরা তওবা, আয়াত : ৩৪-৩৫)

চতুর্থ গুণ: যারা নিজ লজ্জাস্থান হেফাযত করে। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন তার লজ্জাস্থান এর হেফাযত করে। নিজের চাহিদা পূরণের জন্য সে কোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে না। নিজের স্ত্রী ও শরিয়তসম্মত দাসী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে তার চাহিদা পূরণ করে না। এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য শুদ্ধতর। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। এবং মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি াবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে।' (সূরা নূর, আয়াত : ৩০-৩১)

পঞ্চম গুণ: এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে। এই আয়াতে মুমিনের দুটি বৈশিষ্ট্য এর কথা বলা হয়েছে : এক. এুমিন আমানতের হেফাযত করে। আমানতের হেফাযত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদান। কোরআন ও হাদিসে বিভিন্ন জায়গায় আমানতের হেপাযতের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন যে তোমরা আমানত তার হকদারকে আদায় করে দেবে।' (সূরা নিসা, আয়াত : ৫৮)

ষষ্ঠ গুণ: অঙ্গীকার পূর্ণ করা। অঙ্গীকার বলতে প্রথমত, দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বোঝায়, যা কোনো ব্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরজ (বাধ্যতামূলক) এবং খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা,

প্রতরণা তথা হারাম। দ্বিতীয় ধরনের অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়। অর্থাৎ একতরফা একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোনো কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা। ওয়াদা পূর্ণ করা ইসলামী আইনে জরুরি ও ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আর অঙ্গীকার পূরণ করো। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’ (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩৪)

সপ্তম গুণ: যারা নিজেদের নামাজের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। সপ্তম বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিন নামাজের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। ‘নামাজের রক্ষণাবেক্ষণ করে’ কথাটা ব্যাপক। এর মধ্যে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যেমন– যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা, কখনো পড়বে কখনো পড়বে না– এমন নয়। সময়মত জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়া। সব শর্ত, আদব ও নিয়মাবলি রক্ষা করে সুন্দর ও সুচারুভাবে আদায় করা।’ (তাফসিরে কাবির ২৩/২৬৩)

আল্লাহ তাআলা আমাদের এসব বৈশিষ্ট্য অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন

মুমিনের জীবনে কোরআনের প্রভাব

মুমিনের যাপিত জীবনে কোরআনের প্রভাব নানাভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। যার কয়েকটি নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

হৃদয় বিগলিত হওয়া: কোরআন সর্বপ্রথম মুমিনের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। যখন সে কোরআন শ্রবণ করে, তখন তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে।’ (সুরা আনফাল, আয়াত: ২)

আত্মার প্রশান্তি লাভ: কোনো সন্দেহ নেই কোরআন তিলাওয়াত আল্লাহর উত্তম জিকির বা স্মরণ। কোরআন তিলাওয়াতে মুমিনের হৃদয়কে প্রশান্ত করে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।’(সুরা রাদ, আয়াত: ২৮)

সিজদায় লুটিয়ে পড়া: মুমিন যখন আল্লাহর বাণী কোরআন তিলাওয়াত করে বা শ্রবণ করে, তারা শ্রদ্ধাবনত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। ইরশাদ হয়েছে, ‘কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলি বিশ্বাস করে, যারা তার দ্বারা উপদিষ্ট হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে আর তারা অহংকার করে না।’ (সুরা সাজদা, আয়াত: ১৫)

গা রোমাঞ্চিত হওয়া: আল্লাহর কোরআন পাঠ করলে মুমিনের গা রোমাঞ্চিত হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ অবতীর্ণ উত্তম বাণীসংবলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত করা হয়। এতে যারা তাদের প্রতিপালকের ভয় করে, তাদের গা রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পতপ্রদর্শক নেই।’ (সুরা ঝুমার, আয়াত: ২৩)

কান্না করা: মুমিন কোরআন তিলাওয়াত করলে তার হৃদয় বিগলিত হয় এবং তারা কান্না করে। ইরশাদ হয়েছে, 'রাসুল (স.) এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখবে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদের সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কোরো।' (সুরা মায়িদা, আয়াতঃ ৮৩)

আধার থেকে আলোর পথে: কোরআন মুমিনদের আধার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এটা দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদের সরল পথে পরিচালিত করেন।' (সুরা মায়িদা, আয়াতঃ ১৬)

কোরআন ব্যতীত মুমিনের জীবন অর্থহীন

নশ্বর এই পৃথিবীতে আল্লাহর অবিনশ্বর কালাম আল কোরআন। আল্লাহ যেমন অনাদি তাঁর কালাম বা বাণীও তেমনি অনাদি। মহাগ্রন্থ আল কোরআন অমর অজর অব্যয় অক্ষয় এক মহা বিস্ময়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ নিজেই বলেছেন- "আমি এই আমানত (পবিত্র বাণী বহনের গুরুভার) দিতে চেয়েছিলাম আকাশমন্ডলী, ভূমন্ডল ও পর্বতমালাকে। কিন্তু তারা এ আমানত বহনে স্বীকৃত হলো না। অতপর এটি বহনে নিয়োজিত হয় মানুষ। নিঃসন্দেহে তারা এক ধরনের অমিতাচারী ও অজ্ঞ।" (সূরা আহযাব : ৭২)

পবিত্র কোরআন নিজেই তার পরিচয়। এর বাণী, মর্ম, আহ্বান ও আবেদন তুলনারহিত। পৃথিবীর মানুষের সাধ্য কী কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করে। একে বোঝাই যেখানে ভার ব্যাখ্যা সেখানে কত কঠিন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন– "যদি আমি এ কোরআন পর্বতের উপর নাযিল করতাম তোমরা দেখতে পেতে যে, আল্লাহর ভয়ে ভীত কম্পিত হয়ে পর্বতটি বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এসব উপমা আমি দিয়ে থাকি যেন মানুষ চিন্তাভাবনা করে।" (সূরা হাশর : ২১)

আল্লাহ যেমন বড়, তাঁকে চেনা, বোঝা ও পাওয়া যেমন কঠিন তাঁর কালামও তেমনি হত, যদি না তিনি দয়া করে মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিতেন। সূরা আর-রহমানে বলা হয়েছে– " পরম করুণাময় আল্লাহ, শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ।" (সূরা আর-রহমান : ১৪)

অতীতের যত আসমানী গ্রন্থ সবই দুরাচারী মানুষ কর্তৃক বিকৃত হয়ে গেছে। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক এসবে প্রবিষ্ট হয়েছে অনেক অপলাপ। কালের বিবর্তরেন ভাষার প্রবাহে এসব হয়ে গেছে মানুষের দুর্বোধ্য। এ তিনটি সঙ্কট থেকে পবিত্র কোরআন চির বিমুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন– "আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর সংরক্ষক।" (সূরা হিজর : ৯)

"কোনো মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারে না, সামনে দিছের না, পেছন দিয়েও না। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" (সূরা হা মীম সাজদাহ : ৪২)

“কোরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, উপদেশ গ্রহণ করার মত কেউ কি আছে?”-(সূরা কামার : ১৭)

এ যে মানুষের রচনা নয়, নয় সৃষ্টি। কথা, কবিতা, কল্পিত সাহিত্য কিংবা জ্ঞানের অর্জনও নয়। এ হচ্ছে মহান আল্লাহর অনুপম অতুলনীয় বাণী। কেউ যেন কোন দিন কোরআন নিয়ে বিভ্রান্তির শিকার না হয়, এর সাথে জ্ঞান, গবেষণা, প্রতিভা বা সৃজনশীলতার উপর ভর করে পাল্লা না দেয় সে জন্য মহান আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন– “এ কিতাব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হলে লোকেরা এর মধ্যে অনেক অসঙ্গতি পেত।” (সূরা নিসা : ৮২)

“আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে এর অনুরূপ কোনো সূরা নিয়ে আস আর তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে অন্য সকল সাহায্যকারীকে ডাক। যদি তোমরা না পার, বস্তুত তোমরা পারবেও না। তাহলে তোমরা জাহান্নামকে ভয় কর, যার ইন্দন হবে মানুষ ও পাথর। তা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।” (সূরা বাকারা : ২৩, ২৪)

মানুষ যখন আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করে করে গাফেল হয়ে যায়, আল্লাহর স্মণ্ডু থেকে দূরে সরে যায়, অকৃতজ্ঞ হয়, অবিশ্বাস শুরু করে, শিরক ও কুসংস্কারে আক্রান্ত হয়, পথভ্রষ্টায় নিমজ্জিত হয় তখন সতর্ককারী নবী-রাসুল আসেন। অতীতে এমনই নিয়ম ছিল। যে যুগে মানুষ তাদের যে কৃতিত্বটি সম্ভল করে দম্ভ অহংকারের শিকার হত, দেখা গেছে সে যুগের নবী এরচেয়ে শক্তিশালী নতুন কিছু কৃতিত্ব নিয়ে তাদের মাঝে এসে হাজির হয়েছেন। তারা যতই দক্ষ ও পারঙ্গম হোক নবীর আনা চমকটির সামনে তারা হয়ে যেত অসহায়। তাদেরকে অক্ষম করে দেয়া এ বিষয়গুলোকেই বলা মুজিযা। অতীতে যাদুবিদ্যার উৎকর্ষের সময় মুজিযা নিয়ে আগমন করেন হযরত মূসা আ., যার লাঠি সাপ হয়ে গিলে ফেলে সে যুগের সকল যাদু। হযরত ঈসা আ. এলেন জীবনদায়ী সুস্থতা নিয়ে, তার যুগে চিকিৎসা শাস্ত্র চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স. শেষ যামানায় দুনিয়ায় এলেন কাব্য ও কথাসাহিত্যে বিশ্বসেরা গর্বিত আবর জাতির কাছে। দুনিয়ার অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সকল সাহিত্যের দর্প চূর্ণ করে দিতে তাঁর মুজিযা স্বরূপ নাযিল হল পবিত্র আল কোরআন। জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাস ও দর্শনের গৌরবও চিরতরে ম্লান করে দিল এই কোরআন। বলা হল–

“এটি এমন এক কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই।” সূরা বাকারা : ২

আরবের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিরা বিশেষ করে কাবাগাত্রে ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তকের দাম্ভিক রচয়িতা ও বোদ্ধারা নির্বাক হয়ে কোরআনের অরৌকিকত্ব মেনে নিয়ে নিজেরাই পরাজয় স্বীকার করে নিল। উপরন্তু কাবাগাত্র থেকে তাদের কাব্যকথা নিজেরাই অপসৃত করে ঘোষনা দিল যে– “এটা কোনো মানুষের বাণী নয়।”

শুধু তাই নয়, মহানবীর সময় থেকে তার নবুওয়াতের সময়সীমা তথা রোজ কিয়ামত পর্যাল্প মানবজাতির সমুদয় জ্ঞান সাহিত, দর্শন ও চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে এই কোরআন বলে দিয়েছে, মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য নাযিলকৃত এক অদ্বিতীয় উপমারহিত এই কিতাবই বিশ্বমানবের চুড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠ উৎসগ্রন্থ–

“আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যারূপে; মুসলমানদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ।” সূরা নাহল : ৮৯

এানুষ মনে করে কোরআনে কোন খুঁত বা বৈপরীত্য বের করবে। যেমন, এক্কায় অবিশ্বাসীরা একসময় বলল। কোরআনে বলা হয়েছে– “কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।”– সূরা শুআরা : ১৯৫

“এ কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।”– সূরা ইউসুফ : ২

কোরআনের ভাষা যেমন আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ, এর অর্থ মর্ম ও আবেদনও তাঁরই নির্দেশনায় কোরআনের ধারক ও বাহক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ। সাহাবাংয়ে কেরাম বিশেষ করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. গহ বড় বড় সাহাবী কোরআনের প্রধান ব্যাখ্যাতা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকেই এসব রাভ করেছেন। নতুন করে কোরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ও অবকাশ খুব সামন্যই রয়েছে। নতুন কিছু করতে চাইলে এর প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি মেইেন করতে হবে। তাছাড়া নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব হচ্ছে পবিত্র কোরআনের বাস্তবরূপ, তিনি কোরআনের মূল শিক্ষক, ব্যাখ্যাতা ও বাস্তবায়নকারী। কোরআন ও রাসূল উভয়ে উভয়ের সম্পূরক, যা ইসলামের বৈশিষ্ট্য। কিতাব ও রিজাল নীতির দৃষ্টান্ত।

মানুষ নিজে যা অপরকে তাই মনে করে, এটি মানুষের সহজাত স্বভাব। কোরআনের ক্ষেত্রেও অনেকে এই স্বভাবের শিকার। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নববী মূলনীতি ও দীনী ইলমের মাধ্যমে অর্জিত মননশীলতা না থাকার কারণে কোরআনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই মনে করে ভুল করতে পারে। রাজনীতি বা সশস্ত্রবিপ্লবের প্রবক্তা ব্যক্তি মনে করতে পারে রাজনীতি ও সশস্ত্র বিপ্লবের বই। বিজ্ঞানী ভাবতে পারে কোরআন বিজ্ঞানগ্রন্থ, দার্শনিকের কাছে দর্শনের কিতাব। সাহিত্যিক মনে করতে পারে এটি সাহিত্যগ্রন্থ। ইতিহাসবিদের চোখে কোরআন মহান দিশা। ধার্মিকের নজরে এটি ধর্মগ্রন্থ। অধ্যাত্মবাদী পাঠকের মনে হবে এ যেন সাধনার বই। আইনজ্ঞের জন্য এটি মহান আইনগ্রন্থ। বিধাকের বিবেচনায় এটি বিশ্বসংবিধান, প্রকৃতিবিজ্ঞানের নানা দিক কোরআনে বিবৃত- আছে ভূগোল, জীব, জড় ও পদার্থবিজ্ঞান। আছে খোদাতত্ত্ব, পারলৌকিক জীবনের বিশদ বর্ণনা। আগ্রহীরা একে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে যেকোনো সাবজেক্টের কিতাব বলে দাবি করে বসতে পারে। কিন্তু আসলে কোরআন কী, কোন সাবজেক্টের কিতাব? এর জবাব আমাদের পেতে হবে কোরআন থেকেই। তালাশ করতে হবে কোরআনের ধারক ও মহান শিক্ষক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে– “মহাগ্রন্থ আলকোরআনের বাস্তবরূপই ফুটে উঠেছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরিত্র ও আদর্শে। কোরআনই ছিল তাঁর চরিত্র ও আদর্শ। আসুন, কোরআন থেকে আল্লাহর বানীতে শুনে নিই কোরআনের পরিচয়, কোরআনের সাবজেক্ট। ইহা মানবজাতির হেদায়েতের কিতাব। আরকোরআন হচ্ছে মানুসের পথ প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত। একে যে যার ইচ্ছা ও রুচি মাফিক বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থ বলে পরিচিত ও আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। এর পরিচয় আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন, এ হচ্ছে মানুষের জীবনজিজ্ঞাসার জবাব।

আলকোরআন সংশয়, সন্দেহ ও দোদুল্যমানতার নিরসন। নিরাময় ও রহমত, কৃপা ও করুণা, আলোবর্তিকা, শিফা, যিকর, হুদা। দলীল, প্রমাণ, নিদর্শন, উপদেশ ও প্রজ্ঞা। বাসায়ের, বুরহান, মাউয়িযা, হুজ্জত, ইলম ও হিকমাহ।

যদিও কোরআনের বৈশিষ্ট্য মুমিনের বিশ্বাসের দ্বারাই সমুজ্জ্বল এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব ইমানদারের চেতনার আলোয়ে প্রজ্জ্বলিত তথাপি সকলের জ্ঞাতার্থে পবিত্র কোরআন এর কিছু অসাধারণ অনন্যতা তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন, কোরআন গদ্য বা পদ্য কোন রীতিই সর্বাংশে অনুসরণ করেনি। অসংখ্য এমন বিষয় কোরআনে অবতারনা করা হয়েছে যে সম্পর্কে মানুষ দেড় হাজার বছর আগে তো জানার প্রশ্নই ওঠে না, গত দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ বছর আগেও তারা এসব বিষয়ে কিছুই জানত না। উদাহরণসরূপ বলা যায়, মাতৃগর্ভে সন্তানের জন্মবৃত্তান্ত, পৃথিবী ও সৌরজগতের গতি, মানবদেহের ত্বকের অনুভূডু প্রবনতা, পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার ও বহির্মুখিতা, লোহার অবতীর্ণ হওয়া ও গতিশীলতা, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, জীবনোপকরণ ও বৃষ্টি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। অতীতের সকল ধর্মগ্রন্থ তা আসমানী বলে খ্যঠু হোক আর মানবরচিত হোক এর কোনটিই উন্নত আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে টেকে না। কিন্তু একমাত্র কোরআনই এর ব্যতিক্রম। বিজ্ঞানের নির্ভুল কোনো উদ্ভাবন ও অনুসন্দানই কোরআনের বর্ণিত বাস্তবতার বিপরীত হতে পারে না। কেননা বিজ্ঞানময় এই কোরআন যার বানী, গেন সর্বশক্তিমান আল্লাহই বিজ্ঞানের স্রষ্টা। সৃষ্টিজগৎ তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক নীতি, অঙ্ক, নিখুঁত পরিমাপ ও অবধারিত পরিণতি নির্ধারণ কওেন সৃষ্টি করেছেন। অতএব বিজ্ঞান ও দর্শনের বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হচ্ছে স্রষ্টার বাণী পাক কোরআন। পবিত্র কোরআন সাত সমুদ্রের চেয়েও বড়। আকাশ ও পৃথিবীর চেয়েও বিশাল। এর একটি হরফে দশটি করে নেকি, তা বুঝে হোক আর না বুঝে হোক। পবিত্র কোরআন কবরে মুমিনকে সঙ্গ দেবে, সাহস দেবে এবং পরকালে শাফাআত করবে। কোরআন হেফজকারী, চর্চাকারী, এর উপর আমলকারী রোজ হাশরে নিরাপদ থাকবে, সম্মানিত হবে, উর্ধ্বারোহণ করবে, অপরকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

মুমিনের প্রার্থনা হওয়া উচিত যে, হে আল্লাহ! তুমি আদমাদের রাতদিন অধিকহারে তোমার কালাম কোরআন তিলওয়াত করার তৌফিক দান কর। আমাদের কবরের অস্বস্তি কোরআনের পরশে বিদূরিত কর। কোরআন যেন সব বিপদে ঢাল হয়ে দাঁড়ায়, যেন এ কিতাব হয় আমাদের জন্য মুক্তির দলিল ও সুপারিশকারী।

যারা কোরআনের স্বরূপ সম্পর্কে জানেন তারা তেলাওয়াতের সময় মনে করেন যে, আল্লাহ যেন তাদের বলছেন, পড়তো আমার কিতাব, দেখি কেমন পার। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা নিজের কণ্ঠের উত্তম ব্যবহারে কোরআনকে সুন্দররূপে পাঠ কর। অনেক ভক্ত কোরআনপ্রেমিক কোরআনকে তার নিজের প্রতি আল্লাহর প্রত্যক্ষ বার্তা হিসেবেই পাঠ করে থাকেন। তাদের কানে যখন কোরআনের বানী পৌছে তখন অভিভূত হন। তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস বেড়ে যায়। কোন আয়াত তাদের শরীরকে রোমাঞ্চিত করে। তাদের অন্তরাত্মা প্রকম্পিত হয়। হৃদয়ের আবেগ অশ্রু হয়ে ঝরে। তারা সেজদায় নত হন, বিনয়ে হন গভীর আনত। তাদের গোটা অস্তিত্বটুকু নিঃশেষে নিবেদিত হয় আল্লাহর নৈকট্য ও আনুগত্যে, প্রেমে ও সান্নিধ্যে, পরিচয় ও প্রাপ্তিতে। মহান আল্লাহ বলেন– “মুমিন তারাই যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর কম্পিৃঠ হয়, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তেরাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। তারা তাদের প্রতিপালকের উপরেই ভরসা করে।”– সূরা আনফাল : ২

কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক হওয়া উচিত পরম আরাধ্য মওলার কথা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি একজন উষ্ণহৃদয় বান্দার আবেগঘন সম্পর্ক ও ভক্তিশ্রদ্ধার এ্র। তাছাড়া এ পৃথিবীতে আর আছেই বা কী? পৃথিবী মহাসৃষ্টির তুলনায় বিশাল প্রান্তরে একটি৫ ছোট মুদ্রার চেয়েও ক্ষুদ্র। মহান স্রষ্টার সাথে পৃথিবীবাসীর কোনই যোগসূত্র থ০শবে না যদি তাঁর কালাম না থাকে। যদি নবুওয়াত ও রিসালাতের মাধ্যম না থাকে। এজন্যই আল্লাহ কোরআনকে তাঁর রজ্জু বলে ঘোষনা দিয়েছেন। বলেছেন– "তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পরে বিছিন্ন হয়ো না।"– সূরা আলে ইমরান : ১০৩

এক মনীষী বলেছেন, আল কোরআন আমার দৃষ্টিতে এমন একটি জানালা যার মাধ্যমে আমরা পরকাল দেখতে পাই।

আদি থেকে অস্তিত্তবান মহাবিজ্ঞানময় সুনিবন্ধিত ও সুরক্ষিত ফলকে অঙ্কিত এই কিতাব এত কিছুর পরেও অদ্ভতু রকম মানবিক ও পার্থিব। এভাবে বলা শোভনীয় নয় জেহের বোঝবার জন্য বলতে হয়, সুপার ডিজিটাল হওয়ার পাশাপাশি একই সাথে নর্মাল ও ম্যানুয়াল। এই কিতাব যখন নাযিল হয় তখনকার নৈমিত্তিক বিষয়াদি নিয়ে কথা বলে, প্রশ্ন এলে জবাব দেয়, নতুন সমস্যার সমাধান দেয়; জীবন, জগৎ ঘটনার ঘনঘটা সবই ছুঁয়ে যায়। একদিকে এতে যেমন অতীত ইতিহাস বিবৃতি হয়, তেমনি অপর দিকে বিধৃত হয় ভবিষ্যদ্বাণী। আয়াত ও সূরা লিখিত কাগজ বা ফলক আকারে নয়, অবতীর্ণ হয় উচ্চারণ ও পাঠরূপে। অঙ্কিত হয় মানবীয় স্মৃতিপটে। এরপর মানবিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় বিস্রস্ত উপায়ে। বিস্ময়কর এ কিতাব পৃথিবীতেহ একমাত্র গ্রন্থ যা মানুষ মুখস্থ করতে পারে, রাখতে পারে এবং আজীবন পুনরাবৃত্তি করতে পারে। শুধু তাই নয়, এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর, শব্দ, আয়াত, যের, যবর, পেশ, এমনকি বিন্দু বা নুকতা পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুরক্ষিত; যেমন অবিকৃত এর মর্ম, বোধ, বিধান ও আবেদন। মহান আল্লাহ বলেন– " আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর সংরক্ষক।"– সূরা হিজর : ৯

"কোনো মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারে না, সামনে দিয়েও না, পেছন দিয়েও না। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।"– সূরা হা মীম সাজদাহ : ৪২

মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী

মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন– "পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোই পূণ্য বা সৎকর্ম নয়, বরং সৎকর্ম হলো : যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা ও নবী- রাসুলগণের প্রতি ইমান আনবে আর তাঁরই মহব্বতে অর্থাৎ ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় করবে এবং যারা সারাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, কৃত অঙ্গীকার পূরণ করে এবং অভাবে, কষ্টে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করে, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী আর তারাই তাকওয়াবান অর্থাৎ পরহেযগার। (সূরা আল বাকারা : ১৭৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন– " নিশ্চয় মুমিন তারা, যারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান আনে, অতঃপর কোনো রূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করে, আর তারাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরা হুজরাত : ১৫)

মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন– “নিশ্চিতভাবে সে-সব মুমিনই সফলকাম হয়েছে,যারা নিজেদের সালাত এ বিনয়াবত; যারা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তাও কাজ থেকে বিরত থাকে; যারা যাকাত আদায় করে; এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভ দাসীদের* ক্ষেত্রে হেফাযত না করলে তারা তিরষ্কৃত হবেনা। অতঃপর কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারাই হবে সীমালংঘনকারী। এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে সাবধান থাকে; এবং তাদের সালাতসমূহের হেফাযত করে; তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা ফিরদাউস লাভ করবে আর সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা আল মুমিনুন : ১-১১)

রাসুর স. বলেছেন– “হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসুল সা. উলেছেন, ঈমানের সত্তর অথবা ষাটটির বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা তেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। (সহিহ মুসলিম)

একজন মুমিনের দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় বিষয়সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. করণীয় বিষয় বা কাজ ২. বর্জনীয় বিষয় বা কাজ

দৈনন্দিন জীবনে করণীয় বিষয়সমূহ

মুমিন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে করনীয় বিষয়সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করাঃ

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া ইসলামের মহান শিক্ষা। রাসুল সা. বলেনঃ “হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিতঃ মহানবী সা. বলেছেন, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না াবেং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” (জামি তিরমিজি)

প্রতিবেশির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

যে কোনো প্রয়োজনে প্রতিবেশী সবার আগে এগিয়ে আসে। আলকোরআনে সকল প্রকার প্রতিবেশীৈ সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম-মিসকিন, প্রতিবেশী, নিকটতম আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, চলার পথের সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাসী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা বআন নিসাঃ ৩৬)

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ইমানের পরিপন্থী কাজ। রাসুল সা. বলেনঃ ‘হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।’ (সহিহ বুখারী)

রাসুলুল্লাহ সা. আরও বলেন: “হযরত আবু শুরাইহ রা. থেকে বর্ণিত: নবী সা. বলেন, আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ইমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ব্যক্তি ইমানদার নয়। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! কে গেন ব্যক্তি? জবাবে তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। (সহিহ বুখারী)

অধীনস্থদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা:

বর্তমানে কৃতদাস প্রথা না থাকলেও অধীনস্থদের উপর বিভিন্নভাবে জুলুম-অত্যাচার অব্যাহত রয়েছে। সেজন্য রাসুল সা. এর নির্দেশ অধীনস্থদের বেলায় একইভাবে প্রযোজ্য হবে। “হযরত আবু যার রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন, তোমাদের ভাইদের আল্লাহ তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তাকে তার তা-ই খাওয়ানো উচিত, যা সে নিজে খায় এবং তাকে তা-ই পরিধান করানো উচিত, যা সে নিজে পরিধান করে। তার উপর তার সাধ্যাতীত কর্মভার চাপাবে না। যদি তার উপর কখনো অধিক কর্মভার চাপানো হয়, তবে সে যেন তাকে সাহায্য করে। (জা'মি তিরমিজি)

এ প্রসঙ্গে রাসুল সা. এর খাদিম হযরত আনাস রা. বলেন: “আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসুল সা. এর খেদমত করেছি, তিনি আমাকে কখনো ‘উহ’ শব্দটি বলেননি এবং কখনো বলেননি। এটা করনি কেন? ওটা করো নি কেন? আমার বহু কাজ তিনি নিজে করে দিতেন। (সুনানে আবু দাউদ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, একজন রাসুল সা. এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, একজন ভৃত্যকে দৈনিক কতবার ক্ষমা করা যায়? জবাবে রাসুল সা. বলেন, প্রতহ সত্তরবার। (জা'মি তিরমিজি)

আত্মীয়তার সম্পর্ক/বন্ধন রক্ষা করা:

পৃথিবীর মানুষ জন্ম ও বৈবাহিক সূত্রে পরস্পরের আত্মীয়। ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার উপর অহৈশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “সৎকর্ম হলো: যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগন ও নবী-রাসুরগণের প্রতি ইমান আনবে আর তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্য সম্পদ ব্যয় করবে এবং যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, কৃত অঙ্গীকার পূরণ করে এবং অভাবে, কষ্টে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করে, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী আর তারাই তাকওয়াবান। (সূরা আল বাকারা: ১৭৭)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ইমানের দাবি। রাসুল সা. বলেন: “কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা হালাল নয়। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামি হবে। (সুনানে আবু দাউদ)

ঘযরত জুবায়ের ইবনে মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মিশকাতুল মাসাবিহ)

নিয়মিত জামাতে সালাত আদায় করা:

সালাত ইসলামের ৫টি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। নিয়মিত জামাআতে সালাত আদায় করা মুমিনের জন্য অবশ্য পালণীয় ফরজ কাজ। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা ৮২ বার সালাত কায়েমের কথা উল্লেখ

করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। (সূরা বাক্বারা: ৪৩)

মুমিন ও কাফের ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যই হলো সালাত। মহানবী সা. বলেন: মুমিন ও কাফের ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যই হলো সালাত পরিত্যাগ করা। (তিরমিজি)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুমিনের অপরিহার্য কাজ:

সমাজের মানুষকে আল্লাহ তাআলার দেখানো সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সমাজে এমন কিছু লোক থাকা উচিত যারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন: “আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে আর ভালো কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজে বারণ বা বাধা প্রদান করবে, আর তারাই হলো সফলকাম।” (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের নির্বাচনকরাহয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।” (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

একজন মুমিন সমাজের শৃংখলা রক্ষায় সর্বদা সামর্থ্য অনুযায়ী পাহারাদারের ভূমিকা পালন করবে। এ প্রসঙ্গে রাসুল সা. বলেন: “হযরত আবু সাঈদ আল খুদরি রা. রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ শারিয়াহ বিরোধী কাজ হতে দেখলে সে তা হাত (শক্তি) দিয়ে প্রতিহত করবে। আর যদি তার শক্তি না থাকে তবে মুখ দ্বারা, আর যদি এরও শক্তি না রাখে তবে তা অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। আর এটাই হলো ইমানের দুর্বলতম স্তর।” (সহিহ আল মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং-৪৯)

রাসুল সা. আরও বলেন: “হযরত হুযাইফা ইবনু ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন: যার হাতে আমার প্যঠু তাঁর শপথ, তোমরা অবশ্যই অবশ্যই মানুষকে ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। অন্যতায় আল্লাহ তোমাদের উপর অবশ্যই আজাব নাজিল করবেন। এরপর আল্লাহকে ডাকলে তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না।” (জা’মি তিরমিজি)

পরস্পর সালাম বিনিময়:

সালামের ব্যাপকপ্রচলন দরদি সমাজ গঠনের হাতিয়ার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন: “অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহর নিকট থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র অধিবাদন।” (সূরা আন নূর: ৬১)

আল্লাহ আরও বলেন: “আর তোমাদেরকে যদি কেউ অভিবাদন করে, তবে তোমরাও তাকে তার চেয়ে উত্তম অভিবাদন কর অথবা অনুরূপ অভিবাদন ফিরিয়ে বল। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।” (সূরা আন নিসা: ৮৬)

মুসলমানদের পরস্পরের উপর ছয়টি হকের অন্যতম হক হলো সালাম। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন: এক মুসলিমের উপর আওেশ মুসলিমের ছয়টি হক আছে: অসুস্থ হলে সেবা

করবে, মৃত্যু হলে জানাজায় শরিক হবে, দাওয়াত বা আহ্বানে সাড়া দিবে, সাক্ষাৎ হলে সালাম দিবে, হাঁচি দিলে জবাব দিবে, উপস্থিত অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় সে অপর মুমিনের কল্যাণ কামনা করবে। (মিশকাতুল মাসাবিহ)

হাদিয়া আদান-প্রদানঃ

ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যদেরকে উপাহার ও উপঢৌকন আদান-প্রদান করাকে হাদিয়া বলে। মুসলমানদের পারস্পরিক ভালোবাসা, আস্থা ও বিশ্বাস এবং সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ, আন্তরিকতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাদিয়ার গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। রাসুল সা. বলেনঃ আবু হুরায়রা রা. নবী সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ তোমরা একে অন্যকে হাদিয়া দিবে, তাহলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে। (আল আবাদুল মুফরাদ লিস সহিহ আল বুখারি, হাদিস নং- ৫৯৪)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিতঃ নবী কারীম সা. বলেনঃ হে মুসলিম নারী সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীকে হেয় প্রতিপন্ন করওেব না। বকরির ক্ষুর পরিমাণ হওৈর এমন কিছু আদান-প্রদানের মাধ্যমে তার সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখ। (সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল হিবা ওয়া ফাদলিহা ওয়াত তাহরিদি আলাইহা)

কাছের প্রতিবেশীকে হাদিয়া প্রদান এ অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম। হাদিসে বর্ণিত আছে – “হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি রাসুল সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দুইজন প্রতিবেশি আছে, তার মধ্যে কাকে (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) হাদিয়া দিব? তিনি বলেন, যার ঘরের দরজা তোমার অধিক নিকটে সে-ই আগে হকদার। (সহিহ বুখারি)

সহাবস্থান ও সম্প্রীতি বজায় রাখাঃ

সমাজে বসবাসকারী মানুষের সাথে সহাবস্থান করে সম্প্রীতি বজায় রাকার জন্য সকলের সাথে সমঝোতা ও সুসম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শ করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, কিন্তু যে শলা-পরামর্শ কোনো দান-সদকা প্রদান অথবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে পরস্পর সংশোধন ও সন্ধি স্থাপনকল্পে হয়ে থাাকে, তা স্বতন্ত্র। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে এ ধরনের কাজ করবে খুব শীঘ্রই আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দিব।” (সূরা আন নিসাঃ ১১৪)

সম্প্রীতি ও সহাবস্থান বজায় রাখতে উদ্যেঠসগ্রহণকারীর জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে বিরাটচ পুরস্কার। হযরত নুমান ইবনে বাশির রা. থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, তুমি ঈমানদারদের পারস্পরিক সহানুভূড়ু, দয়া, বন্ধুত্ব এবং অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যা দেখতে পাবে। যখন শরীরের কোনো একটি অঙ্গ ব্যথা পায়, তখন এর কারণে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গেন একই ব্যথা অনুভব করে। (সহিহ আল বুখারি, কিতাবুল আদাব)

ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন মুমিনের দায়িত্বঃ

আদর্শ সমাজ গঠনে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলাম যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)

ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ থেকে ধৈর্য ধারণ করে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা একজন মুমিনের অপরিহার্য সামাজিক দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন: "আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কন। আর পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আল আনফাল: ৪৬)

পরস্পর দয়া ও অনুগ্রহ করা:

মুসলিমগণ সবসময় পরস্পরের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহশীল হবেন এবং এরূপ দয়া ও অনুগ্রহ করার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শনকারীদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষণ করেন। সুতরাং তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আকাশের মালিক তোমাদের প্রতি দয়া ও রহমত বর্ষণ করবেন। (সুনানে আবু দাউদ ও জা'মি তিরমিজি)

সুসম্পর্ক বজায় রাখা:

একজন মুমিন ব্যক্তির পক্ষে াপর মুমিন ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক বজায রাকা আবশ্যক তথা ইমানি দায়িত্ব। তিন দিনের বেশি মুসলিম ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়িজ নেই। হযরত আবু হুরাযরা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন: কোনো মুসলিমের জন্য জায়িজ হৈন যে, সে তার কোনো মুমিন ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকে। তিন দিন উত্তীর্ণ হতেই সে যেন তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম দেয়। যদি সে সালামের জবাব দেয়, তবে উভছেন সওয়াবের অংশীদার হবে। আর যদি সে সালামের জবাব না দেয়, তবে সে পাপী হবে, এবং সালামদানকারী মুসলমান সম্পর্কচ্ছেদজনিত গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। (সুনানে আবু দাউদ)

পরস্পরের দুঃখ-কষ্টে এগিয়ে আসা:

সমাজবদ্ধ জীবনে একে অন্যের সহযোগিতা অপরিহার্য। কোনো মুমিন অন্য মুমিনের দুঃখ-কষ্ট ও সংকটে এগিয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা তার বিপদে ও সংকটে সাহায্য করেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কস্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আকিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাহর সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মুকাদ্দামাহ)

নিজের জন্য যা পছন্দনীয় অন্যের জন্য তা পছন্দ করা:

নিজের জন্য যা পছন্দ করা হয়, অন্যের জন্য তা পছন্দ করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হযরত আনাস রা. নবী কারীম সা. থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন, তোমাদের কেহই মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা তার নিজের জন্য পছন্দ করবে। (সহিহ আল বুখারি, আবওয়াবুল মাযালিম ওয়াল কিসাস)

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণের ভিত্তি ভ্রাতৃত্ববোধ:

মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণের ভিত্তি হলো ভ্রাতৃত্ববোধ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা একে নিয়ামত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু তখন আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথা স্মরণ কর। তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়ে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তাঁরই অনুগ্রহ ও মেহেরবানিতে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিছেয়।" (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন: "মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দু ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দঠর এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (সূরা আল হুজরাত: ১০)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. মুমিনদের সামাজিক দায়িত্বের ব্যাপারে বলেন, হে মুমিনগণ তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ করো না, একে অন্যের গোপন বিষয় খোজ না, একজন অন্যজনের সাথে রাগারাগি কর না, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ কর না, কোনো কিছুর বিনিময়ে একজন অন্যজনকে ক্রয়-বিক্রয় কর না, বরং তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, সে তার ভাইয়ের প্রতি জুলুম করবে না, তাকে লাঞ্চিত করবে না, তাকে অপমান করবে না। আর তাকওয়া এখানে, এরপর হাত দিয়ে তিনবার নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কোনো ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অপমান করে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম। (সহিহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াছ ছিলাতি ওয়াল আদাব, বাবু তাহরিমি যুরমিল মুসলিমি)

অন্য একটি হাদিসে এসেছে: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যেকেই অপর মুসলমান ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। যদি সে তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে খারাপ কিছু দেখে, সে যেন তার থেকে বিদূরিত করে। (জা'মি তিরমিজি)

জা'মি তিরমিজি ও সুনানে আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আছে যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের আয়নাস্বরূফ। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। সুতরাং এক মুমিন অপর মুমিনের বিনষ্টকারী বস্তু দূর করবে এবং অনুপস্থিতিতে তার অধিকার সংরক্ষণ করবে। (জা'মি তিরমিজি ও সুনানে আবু দাউদ)

অমুসলিমদের সাথে সহাবস্থান:

ইসলামে রাষ্ট্রে কিংবা মুসলিম সমাজে বসবাসরত অমুসলিমদের সাথে ভালো ব্যবহার এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। মুসলিমদের মতোই তারা সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। হযরত সাফওয়ান

ইবনে সুলাইম রা. হযরত রাসুল আকরাম সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- মনে রেখ, যে ব্যক্তি কোনো মুয়াহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মানহানী করে অথবা তার কোনো সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি ঐ অত্যাচরী মুসলিমের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব। (সুনানে আবু দাউদ: ৩০৫২ ও জা'মি তিরমিজি)

মজলুম, অসহায় ও দুস্থ মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন:

প্রত্যেক মানুষকে ইসলাম পরস্পরের কল্যাণে মনযোগী হতে এবং ভালোবাসতে শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তাআলা আল কোরআনে ঘোষনা করেছেন: "তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের নির্বাচন করা হয়েছে। (সুরা আলে ইমরান: ১১০)

কেউ যেন অন্যকে কষ্ট না দেয় এবং কারো প্রতি জুলুম অত্যাচার না করে, সেই ধরনের মনোভাব সম্পন্ন করে গড়ে তোলা, মাজলুমকে সাহায্য করা এবং জালিমকে তার যুলুম অত্যাচার থেকে বাধা দেওয়া ইমানি দায়িত্ব।

ঘযরত আউস ইবনে শুরাহবিল রা. থেকে বর্ণিত: তিনি রাসুল সা. কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি জালিমের সাথে থেকে তাকে শক্তি যোগায় অথচ তার জানা আছে যে, লোকটি জালিম, তবে সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেল। (বাইহাকি)

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. আরও বলেন, তুমি তোমার মুমিন ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে জালিম হোক বা মাজলুম। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল সা.! যখন সে মাজলুম থাকবে তখন আমি তাকে সাহায্য করব। কিন্তু কিভাবে জালিমকে সাহায্য করব? ওাসুল সা. বললেন, তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে। আর উহাই হবে তাকে সাহায্য করা। (সহিহ বুখারি, কিতাবু বাদউল ওহি)

ইয়াতিম ও মিসকিনের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য:

ইসলাম সকল মানুষের সাথে সদাচারের শিক্ষা দেয়। বিশেষ করে ইয়াতিম ও মিসকিনকে সহায়তা করার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে। ইয়াতিমের হক আদায় না করা ও মিসকিনকে খাবার না দেওয়ার পওতি আল কোরআনে ভৎর্সনা করে বলা হয়েছে: "তুমি কি তাকে দেখছ যে আখিরাতকে মিথ্যা বলছে? সে-ই তো ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। (সুরা আল মাউন: ১-৩)

আর কোরআনে ইয়াতিমকে সম্মান করতে ও মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে- "কখনই নয়, বরং তোমরা ইয়াতিমকে সম্মান কর না এবং মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে উৎসাহ প্রদান কর না আর তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল। (সুরা আল ফজর: ১৭-১৯)

যারা দুনিয়ার জীবনে ইয়াতিম, মিসকিন ও বন্দিদের উপকার করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাত ও জান্নাতের বহু নিয়ামত দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন:

“তারা আল্লাহর ভালোবাসার অভাবগ্রস্ত, ইয়াতিমও বন্দিদের আহার্য দান করে এবং তাদের বলে আমরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তোমাদেরখেতে দিচ্ছি, আমরা তোমাদের কাছে এর কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাই না।” (সূরা আদ দাহর: ৮)

অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল সম্পদ ভক্ষণ করাকে আগুন ভক্ষণ করা বলে আল কোরআনে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“যারা ইয়াতিমের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা যেন তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করায়। আর শীঘ্রই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সুরা আন নিসা: ১০)

ইয়াতিমের মাল-সম্পদ আটকে না রেখে তাদেরকে দেওয়া কর্তব্য, তাদের ভালো মালের সাথে মন্দ মাল মিশ্রিত করে ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ এবং কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“তোমরা ইয়াতিমের মাল-সম্পদ তাদের দিয়ে দাও, তাদের ভালো মালের সাথে মন্দ মাল মিশ্রিত কর না এবং তাদের মাল-সম্পদ তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে ভক্ষণ কর না। নিশ্চয় ইহা কবিরা গুনাহ। (সূরা আন নিসা: ২)

প্রয়োজন পূরণ করা:

সামর্থ্য কম, চিন্তা ও পদক্ষেপ সীমিত, প্রয়োজন যাকে অনেক অক্ষম করে দিয়েছে এবং কোনো কৌশল জানা নেই, এমন লোকদের প্রয়োজন পূরণ করা একজন মুমিনের কর্তব্য। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

“ তবে পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোনো উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। (সূরা আন নিসা: ৯৮)

ঐ সব অসহায় লোকদের মধ্যে রয়েছে নারী, পুরুষ, শিশু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী, গরিব, যুবক ও বৃদ্ধ। ধনীদের যাকাত ও সদকায় আল্লাহ তাদের অংশ বা হক বাধ্যতামূলক ভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে পার্থিব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।” (সুরা আয যারিয়াত-১৯)

অভাবিদের সহযোতির জন্য যাকাত আদায় করাকে ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। (সুরা আল বাকারা: ৪৩)

একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধান দান করেছেন। ক্ষতি বন্ধনের জন্য কষ্ট দেওয়াকে হারাম করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। (সুরা আল মাউন: ২-৩)

অন্যকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রদানে অস্বীকৃতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং তারা নিত্য ব্যবহার্য সামান্য ও ছোটো-খাটো বস্তু অন্যকে প্রদান করতে নিষেধ করে। (সুরা আল মাউন: ৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল সা. এর যুগে আমরা ‘মাউন’ বলতে বালতি এবং পাতিলকে বুঝতাম। (সুনানে আবু দাউদ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন- ঘরের উপকারী সকল জিনিসকে মাউন বলে। যেমন: কোদাল, পাতিল, আগুন, পানি ইত্যাদি। সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য ইসলাম এ সকল বিষয়কে মুমিনের সামজিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সুপারিশ করাঃ

যাদের কথায় সমাজের লোকেরা পরিচালিত হয় তাদের উপর অন্য ভাইদের জন্য সুপারিশ করা একান্ত কর্তব্য। কেননা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত করা ফরজ। আল কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: "যে লোক সৎ কাজের জন্য কোনো সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে রোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (সুরা আন নিসাঃ ৯১)

হযরত আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিতঃ সুপারিশের বাপারে রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল সা. বলেন, তোমরা সুপারিশ কর, তাহলে তোমাদের জন্যওস সুপারিশ করা হবে। অর্থাৎ যার জন্য সপারিশ করা হবে তার প্রয়োজন পূরণ হোক আর না হোক, সুপারিশকারী পুরস্কৃত হবে। আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবে তার নবীর ওয়াদা নির্ধারণ করবেন। (সুনানে নাসায়ি)

ন্যায়বিচার করাঃ

মানুষের ক্ষতি ও কষ্ট দূর করার জন্য আল্লাহ ন্যায় বিচারকে ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন, এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" (সুরা আন নাহলঃ ৯০)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

"আর তোমরা ন্যায়বিচার কর, তা তাক্বওয়ার অতীব নিকটবর্তী। (সুরা আল মায়েদাহঃ ৮)

ওয়াদা-অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পালন করাঃ

ওয়াদা-অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পালন করা একজন মুমিনের মানবিক চরিত্র ও গুনাবরির অংশ, সামাজিক শৃঙ্খলার নিয়ামক এবং আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (সুরা আন নাহলঃ ৯১)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

"আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সুরা বণি ইসরাঈলঃ ৩৪)

ওয়াদা রক্ষা করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর যারা তাদের যাবতীয় আমানত ও ওয়াদাসমূহ রক্ষা করে। (সুরা আল মুমিনুনঃ ৮)

চুক্তি প্রতিপালন করা:

দুই ব্যক্তি কিংবা দুই পক্ষের মধ্যে কৃত চুক্তি প্রতিপালন করা সার্বিক শান্তি রক্ষার জন্য অতীব জরুরি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“হে মুমিনগণ“! তোমরা যাবতীয় চুক্তি পূর্ণ কর। (সুরা আল মায়িদাহ: ১)

হযঙরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি হাশরের দিন তিন ব্যক্তির বিপক্ষে বাদি হব:

১॥ যে ব্যক্তি আমার নামে শপথ করে কোনো বিসয়ে চুক্তি করার পর তা ভঙ্গ করে।

২॥ যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন লোককে বিক্রি করে এর মূল্য খায় এবং

৩॥ যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিকের কাজে নিয়োগ করার পর তার থেকে কাজ আতায় করা সত্ত্বেও তার পারিশ্রমিক দেয় না। (রিয়াদুস সালিহিন, হাদিস নং- ১৫৮৭)

কাফের অমুসলিম ব্যক্তির সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করাও ওয়াজিব।

যাকাত, সাদকাহ, ফিতর ও কাফফারা প্রদান:

অর্থনৈতিক ভারসাম প্রতিষ্ঠায় মুমিনদের জন্য দান(যাকাত)-কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আল কোরআনের ৮২ জায়গায় উল্লেখ করে বলেন: “আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদা কর। (সুরা আল বাকারা: ৪৩)

যাকাত আদায় করারজন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রকে সেই ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

আদায়কৃত যাকাতের অর্থ সমাজের দারিদ্র্যপীড়িত, অভাবী, ঋনগ্রস্ত, অসহায়, দাস-দাসীর মুক্তি ইত্যাদি প্রভৃত সামজিক কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“যাকাত ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্তদের, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের এবং মুসাফিরদের জন্য, এই হলো আল্লাহ নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (মসুরা আত তাওবা: ৬০)

রমজানের শেষে ঈদুল ফিতরের দিন সাদকাহ প্রদান করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়।

জমিনে উৎপাদিত ফসলে সাদকাহ হিসেবে উশর প্রদান করা ওয়াজিব করা হয়েছে।

আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ ইচ্ছাকৃত পরিত্যাগ করলে যেমন রোজা ভাঙলে, আল্লাহর নামে কসম করে ভঙ্গ করলে কাফফারস্বরূপ সামজের গরিব-মিসকিনদের খাবার খাওয়ানোর জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর এটি যাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে।" (সুরা আল বাকারা: ১৮৪)

দান, খয়রাত ও সাদকায় জারিয়াহ:

দরিদ্র মানষের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

"কিসে তোমাদের জাহান্নাম নিক্ষেপ করেছে? তখন তারা বলল: আমরা সালাত আদায় করতাম না এবং মিসকিনদের খাবার খাওয়াতাম না।" (সুরা আল মুদ্দাসিসর: ৪২-৪৪)

সাদকাহে জারিয়াহ যেমন- পুল, কালভার্ট, যাত্রীছাউনী, টয়লেট, মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, বৃক্ষরোপণ, জনগণের কল্যাণের জন্য সুপেয় পানি পানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজে হাদিছে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত:

রাসুল সা. বলেছেন, যখন কোনো মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি বিষয় ছাড়া। যথা: সাদকায়ে জারিয়াহ, এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষের উপকার হয় এবং এমন নেক ও সৎ সন্তান যে বা যারা তার (পিতামাতার) জন্য দোয়া করে। (রিয়াদুস সালিহিন, অধ্যায়-১৫৮, হাদিস নং- ৯৪৯)

অসিয়্যত:

অসিয়্যতের মাধ্যমে বিত্তশালী ব্যক্তি তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও গরিব ও অভাবীদের আর্থিক উপকার করতে পারেন। এর মাধ্যমে মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতিমখানাসহ অহৈশ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সামাজিক কাজ সুসম্পন্ন করা যায়। আর এ কারনে কুরআন মাজিদে অসিয়্যতকে উত্তরাধিকারের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে (সে সম্পত্তিতে) তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের এক ভাবগ, তারা যে অসিয়্যত করে গেছে কিংবা (তাদের) ঋণ পরিশোধ করার পরই (কিন্তু তোমরা এই অংশ পাবে)।" (সুরা আন নিসা: ১২)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

"যকন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে সম্পদ রেখে যায় তখন পিতামাতা ও নিকটবর্তীদের জন্য অসিয়্যত করা তার উপর ফরজ করা হয়েছে। মুত্তাকীগণের জন্য এটি কর্তব্য।" (সুরা আল বাকারা: ১৮০)

আলোচ্য আয়াতের বিধান মিরাসের তথা উত্তরাধিকারের বিধানসংক্রান্ত আয়াতের মাধ্যমে মানসুখ বা রহিত হওৈর পিতার আগে ছেলের মৃত্যু হলে মৃত ছেলের রেখে যাওয়া বিদবা স্ত্রী ও ইয়াতিম সন্তানদের জন্য এবং এরূপ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অসিয়্যত করা ওয়াজিব এবং ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত একটি মৌলিক নীতি।

তবে অসিয়্যত ব্যক্তির সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি হবে না।

হিবাঃ

বিনা প্রতিদানে কোনো বস্তু অন্যের মালিকানায় দিয়ে দেওয়াকে হিবা বলে। ধনী ব্যক্তি তার অতিরিক্ত সম্পত্তি অভাবী আপনজন ও দরিদ্র লোকদের অভাব দূরীকরণে ব্যয় করবে। হেবার সম্পদ কখনো ফেরত চাওয়া সমীচীন নয়। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন:

"আমার কাছে এর চেয়ে কোনো নিকৃষ্ট উদাহরণ নেই যে, কোনো ব্যক্তি দান করে তা ফেরত চায়। যেমন- কুকুর নিজে বমি করে আবার নিজে খাওয়ার জন্য ফিরে যায়।" (বুখারি, কিতাবুল হিবা ওয়া ফাদলুহা ওয়াত তাহরিদি আলাইহা)

ক্বরদ প্রদানঃ

সমাজের মানুষের দৈনন্দিন আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য করজে্ হাসানাহ্ প্রদান করা অতীব জরুরি। ক্বরদে হাসানাহর মাধ্যমে মানুষ সুদ ও দাদনের অভিশাপ থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

"আর তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তা আল্লাহর কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে।" (সুরা মুয্যাম্মিল: ২০)

হাদিসে করজে্ হাসানাহ্ প্রদানে দান-সাদকাহ্ থেকেও বেশি সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে।

ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করাঃ

ভালো মানুষ সবসময় ভালো কাজ করতে পছন্দ করে। একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মানে ব্যাপকভাবে সর্বত্র ভালো কাজ চালু কার, ভালো কাজে সহযোগিতা করা, ভালো কাজ করতে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ভালো ও উত্তম কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা উত্তম ও সাওয়াবের কাজ। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

"আর তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা কর।" (সুরা আল বাকারা: ১৪৮)

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন:

"আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দৌড়ে, পুতিযোগিতা করে এসো, আর সেই জান্নাতের দিকে (দৌড়ে এসো), যার প্রশস্ততা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সমান।" (সুরা আলে ইমরান: ১৩৩)

সবর বা ধৈর্য অবলম্বনঃ

সবর বা ধৈর্য মুমিনের একটি মহত্তম গুণ। ধৈর্যের মাধ্যমে মুমিন কঠিন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সার্বিক শান্তি বজায় থাকে। ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে মানুষ মিতব্যয়িতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ তাআলা ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

"আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। (সুরা আল বাকারা: ১৫৫)

আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন:

"আর আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।" (সুরা আলে ইমরান: ১৪৬)

এহান আল্লাহ তাআলা বান্দাদের সবর বা ধৈর্য অবলম্বনের জন্য দোয়া শিখায়েছেন: "হে আমার রব! আমাদের ধৈর্যের প্রাচুর্য দান কর আর আমাদের পদক্ষেপকে (অবস্থান) মজবুত কর এবং কাফেরদের উপর আমাদের বিজয় দান কর।" (সুরা আলে ইমরান: ১৪৭)

তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধিতার পথ অবলম্বন করা:

জীবনের সব ক্ষেত্রে তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধিতার পথ অবলম্বইন মুমিনের জীবনের সফলতার চাবিকাঠি। একটি পরিশুদ্ধ সমাজ শান্তির সমাজ। সে সমাজে কোনো জুলুম-অত্যাচার থাকে না। নিজে পরিশুদ্ধিতা অর্জন এবং অন্যদের পরিশুদ্ধ করার কাজ চালিয়ে যাওয়া মুমিনের ইমানি দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হলো, সে সফলতা অর্জন করল।" (সুরা আল আ'লা: ১৪)

আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন:

"তিনি সেই সত্তা, যিনি উম্মিদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবেন, আর তাদের কিতাব বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং তাদের তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধ করবেন।" (সুরা আল জুমুআ: ২)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা:

আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজনে এবং মানুষের জন্যই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে এর বিনিময় এ তাঁর স্মরণ ও ইবাদাতের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তবে আমিও তোমাদের স্মরণ করব, আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ঘর, অস্বীকারকারী হইও না।" (সুরা আল বাকারা: ১৫২)

অকৃতজ্ঞ বান্দাকে আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে আমি তোমাদের(রিজিক) বাড়িয়ে দিব, আর যদি অস্বীকার কর, তবে জেনে রেখ, আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।" (সুরা আল ইব্রাহিম: ৭)

তওবা করা, নিজেকে ও অপরকে ইসলাহ বা সংশোধন করা:

ছগিরাহ্ গুনাহ অজু, নফল ইবাদঠ্ঠ ও নেক আমল তথা সৎ কাজের মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। কবিরাহ্ গড়ু নাহ মাফের জন্য তওবা করা শর্ত। তওবা হলো গুনাহর কাজ থেকে স্থায়ীভাবে ফিরে আসা। তওবার

শর্ত ৪টি। যথা: ১) কৃত গুনাহ স্বীকার করা, ২) গুনাহর কাফফারা আদায় করা, ৩) পুনরায় উক্ত গুনাহ না করার সংকল্প কার, ৪) গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আল্লাহ তাআলার নিকট শুধু তাদের তওবাই (কবুলযোগ্য) হবে, যারা ভুলবশত গুনাহর কাজ করে, অতঃপর (জানা মাত্রই) তারা দ্রুত (তা থেকে) ফিরে আসে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা দয়া পরবশ হন; আর আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী, কুশলী।" (সুরা আন নিসা: ১৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"ওহে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর একনিষ্ঠভাবে।" (সুরা আত্ তাহরিম: ৮)

সবসময় নিজেকে ও অপরকে ইসলাহ বা সংশোধন করা ইসলামের একটি স্থায়ী নীতি। ইসলাহের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"নিশ্চয়ই ঈমানদারগণ পরস্পর ভাই-ভাই, অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যে সংশোধন করে দাও।" (সুরা আল হুজরাত: ১০)

এুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ইসলাহ্ বা সংশোধন করা উত্তম কাজ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর সংশোধন হলো উত্তম কাজ।"

হালাল ও পবিত্র রিজিক বা জীবিকা উপার্জন ও ভক্ষণ:

হালাল ও পবিত্র রিজিক বা জীবিকা উপার্জন ও ভক্ষণ আল্লাহর দরবারে বান্দার ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য সকল পবিত্র খাদ্য হালাল বা বৈধ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমাদের জন্য সকল পবিত্র জিনিস বৈধ করা হয়েছে।" (সুরা আল মায়িদাহ: ৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমরা আল্লাহর দেওয়া রিজিক বা জীবিকা থেকে খাও।" (সুরা আল বাকারা: ৬০)

হালাল জীবিাক অর্জনকারী আল্লাহর বন্ধু। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন:

"জীবিকা অর্জনকারী আল্লাহর বন্ধু।"

সার্বক্ষণিককথায় ও কাজে আল্লাহর তাসবিহ বা প্রশংসা ও জিকির বা স্মরণ করা:

সার্বক্ষণিককথায় ও কাজে আল্লাহর তাসবিহ বা প্রশংসা ও জিকির বা স্মরণ করা বান্দার জন্য আবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায়।” (সুরা আলে ইমরান: ১৯১)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিকভাবে স্মরণ কর।” (সুরা আল আহযাব: ৪১)

পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও পরিবার-পরিজনের আবশ্যকীয় ব্যয় বহন করা:

পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও পরিবার-পরিজনের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, আবাস, চিকিৎসাসহ প্রভৃতি আবশ্যকীয় ব্যয় বহন করা মুমিন ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর তোমরা নিকটাত্মীয়, অভাবী ও মুসাফিরদের অধিকার আদায় কর।” (সুরা বণি ইসরাঈল: ২৬)

পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও পরিবার-পরিজনের ব্যয় বহন করা সাদাকাতুল্য।

পরিবার-পরিজনের ব্যয় বহন করা তাকওয়ার অংশ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর আমার দেওয়া রিজিক থেকে (পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও পরিবার-পরিজনের জন্য) ব্যয় কর।” (সুরা আল বাক্বারা: ৩)

আল্লাহ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা:

আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা কার একান্ত কর্তব্য। বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা করাকে আল্লাহ অত্যধিক পছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের।” (সুরা আল বাকারা: ২২২)

মানুষকে সুসংবাদ দেওয়া:

ভালো ও সুসংবাদ পেলে মানুষ আশাবাদী হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা লাভ করে। সেজন্য একে অপরকে সবসময় ভালো ও সুসংবাদ দেওয়া নৈতিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। হাদিছে মহানবী সা. ভালো ও সুসংবাদ প্রদান করতে উম্মতকে আদেশ করেছেন। রাসুল সা. বলেছেন:

“সুসংবাদ দাও, জটিল কর না। সহজ কর, কঠিন কর না।”

মানুষের জন্য যাবতীয় বিষয় সহজ করা:

মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম সেটা ব্যক্তি কিংবা সামষ্টিক হোক, সহজ করে দেওয়ার মধ্যে উভয়ের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বান্দা যদি বান্দার কাজ সহজ করে, তবে আল্লাহও তাঁর বান্দার কাজ সহজ করে দেন।

আল্লাহ বান্দাকে এ বিষয়ে আল কোরআনে দোয়া মিক্ষা দিয়েছেন:

“হে আমার প্রভু, আমার কাজকে সহজ করে দাও, আর কঠিন কর না।”

হাদিছে মহানবী সা. যাবতীয় কাজ ও বিষয়কে সহজ করার জন্য আদেম করেছেন: “তোমরা সহজ কর, আর কঠিন কর না।”

দৈনন্দিন লেনদেন লিখে রাখাঃ

যাবতীয় লেনদেন দিন, তারিখ, সময় ও স্বাক্ষীসহ রিখে রাখা অতীব জরুরি। নচেৎ শয়তানের প্ররোচনায় লেনদেনে সম্পৃক্ত যে কোনো পক্ষ ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো লেনদেন কর, তা তখন লিখে রাখো।” (সুরা আল বাকারা: ২৮২)

পরকালের কথা সদা স্মরণে রাখাঃ

আখেরাত বা পরকালের জবাবদীহিতা মানুষকে অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। প্রত্যেক মুমিনের সর্বদা পরকালকে স্মরণ করা উচিত। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর তারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।” (সুরা আল বাকারা: ৪)

যাবতীয় আমানতের সংরক্ষণ করাঃ

আমানত রক্ষা করা ইমানের অংশ। যার আমানতদারীতা নেই, তার ইমান নেই। আমানতের খেয়ানত কার মুনাফিকের লক্ষণ। আমানতের খেয়ানতের ফলশ্রুতিতে সমাজে বিপর্যয় দেখা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন যে, তোমরা তোমাদের যাবতীয় আমানত উপযুক্ত পাত্রে প্রদান কর।” (সুরা আন নিসা: ৫৮)

আমানত রক্ষা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর (মুমিন তারা) যারা তাদের যাবতীয় আমানত ও কৃত ওয়াদা পরিপালন করে।” (সুরা আল মুমিনুন: ৮)

আপস-মিমাংসা কারঃ

মুসলমানদের দুইজন বা দলের মধ্যে কলহ দেখা দিলে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।” (সুরা আল হুজরাত: ১০)

সকল ভালো কাজে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা অবলম্বন:

ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা ব্যতীত কোনো কাজে সফলতা পাওয়া যায় না। ইমান, সৎকাজ ও দ্বীনের ব্যাপারে খুলুছিয়্যত একান্ত জরুরি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর তাদের আদেশ করা হয়েছিল দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে খালেছভাবে তাঁর বন্দেগি করার জন্য।" (সুরা আল বাইয়্যেনাহ: ৫)

হক বা সত্যের উপদেশ দেওয়া:

হক বা সত্যের উপদেশ প্রদান করা মুমিন ব্যক্তির সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। সত্যের উপদেশ দানকারী ধ্বংস থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা সুরা আসরে বলেন:

"সময়ের শপথ। নিশ্চয়ই সব মানুষ ধ্বংসে নিমজ্জিত। তারা ব্যতীত যারা ইমান এনেছে, সৎকাজ করেছে আর হকের উপদেশ দিয়েছে ও সবর বা ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" (সুরা আল আসর)

বিশুদ্ধ নিয়্যত অবলম্বন:

ইবাদঠ্‌ ও হৈশ আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যত থাকা আবশ্যক। বান্দার কাজের ফল তার বিশুদ্ধ নিয়্যতের উপর নির্ভর করে।

অহৈশ মৌলিক ইবাদাতে নিয়্যত শর্ত। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সা. বলেছেন:

"নিশ্চয়ই কর্মের ফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। (মেশকাতুল মাসাবিহ)

দৈনন্দিন জীবনে মুমিনের বর্জনীয় বিষয়সমূহ

মুমিন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে বর্জনীয় বিষয়সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো:

শিরক থেকে মুক্ত থাকা:

আল্লাহর জাত ও সিফাতের সাথে অন্য কাউকে শরিক করা হলো শিরক। শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম ও বড় গুনাহ। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। শিরকের গুনাহ একনিষ্ঠ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"শিরক হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ।" (সুরা লোকমান: ১৩)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে কৃত শিরকের গুনাহ তিনি ক্ষমা করবেন না, আর এছাড়া অন্যসব গুনাহ তিনি যাকে চাহেন ক্ষমা করেন।" (সুরা আন নিসা: ১১৬)

বিদআ'ত থেকে বেঁচে থাকা:

বিদআ'ত হলো শরিয়াতের ইবাদাতের মধ্যে নতুন কোনো কিছু চালু করা। ইবাদতের ক্ষেত্রে নতুন যে কোনো পদ্ধতু চালু করা হরাম ও গোমরাহি। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন যে, রাসুল সা. বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো জিনিস উদ্ভাবন করে যা তাতে হৈন, তবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" (সহিহ বুখারী)

বিদআ'ত হলো সর্বনিকৃষ্ট জিনিস। হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বিলেন যে, রাসুল সা. বলেছেন, "সর্বাধিক নিকৃষ্ট জিনিস হলো তা, যা ইসলামের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হয়।" (মিশকাতুল মাসাবিহ)

বিদআ'ত হলো নিকৃস্ট গোমরাহি। হযরত ইরবাজ রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেছেন:

"তোমরা ইসলামে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখ। কেননা প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত ধর্মীয় বিষয় হলো বিদআ'ত। আর প্রত্যেক বিদআ'তই গোমরাহি।" (জা'মি তিরমিজি, সুনানে ইবনেস মাজাহ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবু দাউদ, মিশকাতুল মাসাবিহ)

কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত আদি, বংশানুক্রমিক জাহিলি রসম ও রেওয়াজ অনুসরণ না করা:

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত আদি, বংশানুক্রমিক রসম ও রেওয়াজের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। এসবের চেয়ে আল্লাহর বিধান উত্তম। আল্লাহ তাআলা আল কোরআনে বলেন:

"আর যকন তাদের বরা হয় যে, তোমরা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, আমরা তো ঐ সব বিষয়ের অনুসরণ করি না, যাতে আমরা আমাদের বাপ দাদা ও পূর্ব-পুরুষদের থেকে পেয়েছি। তখন তাদের বলা হয়, তোমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষগণ যদি সঠিক জ্ঞান না রাখে এবং সঠিক পথের অনুসারী না হয়, তবুও কী তাদেরকে অনুসরণ করবে?" (সুরা আল বাকারা: ১৭০)

উপহাস ও দোষারোপ না করা এবং মন্দ নামে না ডাকা:

কোন ব্যক্তিকে উপহাস বা তিরস্কার কার কিংবা মন্দ নামে ডাকা ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ। ভারসাম্যপূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূঔশ সমাজ বিনির্মানের জন্য মুসলিমকে অবশ্যই এসব মন্দ অভ্যাস পরিত্যঠস করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে মুমিনগণ! কোনো জাতি যেন অপর জাতিকে উপহাস না করে। কেননা উপহাসহাসকারী জাতি হতে উপহাসকৃত জাতি উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অপর নারীকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারীণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং একে

অপরকে মন্দ নামে ডেক না। ইমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা নিকৃষ্ট গুনাহের কাজ।" (সুরা আল হুজরাত: ১১)

অহেতুক ধারণা থেকে বিরত থাকা:

প্রমাণ ব্যতীত কোনো মুসলিম এর প্রতি কু-ধারণা বা অহেতুক খারাপ ধারণা পোষণ করা হারাম। এ কারণে সমাজে অনেক বিশৃংখলা সংগঠিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা গুনাহ।" (সুরা আল হুজরাত: ১২)

গীবত থেকে বিরত থাকা:

গীবত অর্থ পরনিন্দা বা পরচর্চা। কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়, তাকে গীবত বলে। গীবত করা কবিরা গুনাহ্ আল কোরআনে গীবত করাকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার শামিল বলে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং মুসলিমকে অবশ্যই এসব পরিহার করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাদে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো এক ঘৃণাই কর।" (সুরা আল হুজরাত: ১২)

অপবাদ না দেওয়া:

অপবাদ গীবতের চেয়ে গুরুতর অপরাধ। কোনো লোকের মধ্যে যে দোষ নেই, তার প্রতি সে দোষ আরোপ করাকে অপবাদ বলে। আরবিতে একে "বুহতান" বলা হয়।

সতী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করা ভয়ানক ধরনের অপরাধ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।" (সুরা আন নূর: ২৩)

এ ধরনের অপবাদের জন্য কোরআনে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তাদের সাক্ষী কখনো গ্রহণ কর না। তারা নিজেরাই ফাসেক।" (সুরা আন নূর: ৪)

অপরের ছিদ্রান্বেষণ বা গোয়েন্দাগিরি না করাঃ

মানুষের দোষক্রুটি খুঁজে বের করাকে ছিদ্রান্বেষণ কলা হয়। এটি কবিরাহ গুনাহ। পৃথিবীতে দোষহীন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনো সমাজের মানুষ যদি পরস্পরের দোষক্রুটি অনুসন্ধানের কাজে লিপ্ত হয় এবং তা প্রচার করতে থাকে, তবে সেই সমাজে শান্তি থাকতে পারে না।

আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"এবং তোমরা পরস্পর গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না।" (সুরা আল হুজরাতঃ ১২)

মিথ্যা পরিহার করাঃ

মিথ্যা গুনাহের মা। মিথ্যা ন্যায়ের মাপকাঠিকে উল্টিয়ে দেয়, বাস্তব সত্যকে বিকৃত করে। একটি মিথ্যা অসংখ্য মিথ্যার জন্ম দেয়। সমাজকে কুলষিত করে। মিথ্যাবদী কখনো হিদায়াত পেতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"আর সেদিন মিথ্যাবাদীদের জন্য ধ্বংস।" (সুরা আল মুতাফফিফীনঃ ১০)

আল্লাহ তাআলা আরেক জায়গায় বলেনঃ

"মিথ্যা কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করেনা এবং তারাই মিথ্যাবাদী।" (সুরা আন নাহলঃ ১০৫)

আল কোরআনে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

"যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন।" (সুরা আল জুমারঃ ৬০)

অভিশাপ না দেওয়াঃ

গালমন্দ ও অভিশাপ সামাজিক বন্ধনকে বিনষ্ট করে। কিছু লোক কারো সাথে সামান্য মতবিরোধ হলেই গালিগারাজ ও অভিশাপের বন্যা বয়ে দেয়। এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. রাসুল সা. থেকে বর্ণনা বলেনঃ "মুসলিম ঐ ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।" (ইবনে হাব্বান)

চুরি ও ডাকাতি না করাঃ

কারো অনুপস্থিতিতে তার রক্ষিত সম্পদ আত্মসাৎ করা বা তাকে না বলে ভোগ করাকে চুরি বলে। ইসলামের দৃষ্টিতে চুরি করা মহাপাপ ও কবিরা গুনাহ। সম্পদ বান্দার হক। তাই কারো সম্পদ চুরি করে থাকিলে তা তাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। সম্পদ ফেরত না দিয়ে তওবা করলে গুনাহ মাফ হবে না। চুরির শাস্তি হাত কেটে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"পুরুষ ও নারী এদের যে কেউই চুরি করবে, তাদের উভয়ের হাত কেটে ফেল; এটা তাদেরই কর্মফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দন্ড।" (সুরা আল মায়িদাহঃ ৩৮)

প্রকাশ্যে অন্যের সম্পদ অস্ত্র ঠেকিয়ে জোরপূর্বক দখলে নেওয়াকে ছিনতাই বা ডাকাতি বলা হয়। ডাকাতি চুরির চেয়ে ভয়াবহ গুনাহ। ডাকাতির শাস্তি ভয়াবহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর যারা আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে আরজকতা ছড়ায়, তাদের শাস্তি হলো: তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা তাদের পার্থিব অপমান। আর তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে কঠোর শাস্তি।” (সুরা আল মায়িদাহ: ৩৩)

উপার্জনে হারাম বর্জন:

ঘারাম বা অবৈধ উপার্জন ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। উপার্জন হারাম হলে ইবাদাত কবুল হয় না।

হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলা মানুষের আয় ও ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ করবেন। “আর সে কোথা থেকে আয় করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে?”

মদ ও জুয়া থেকে বিরত থাকা:

মদ ও জুয়া নাজায়িজ, হারাম ও মস্ত বড় কবিরা গুনাহ। মদ ও জুয়ার কারনে মানুষের নৈতিক জীবনে ব্যাপকভাবে বিপর্যয় ঘটে। মদ পান করার শাস্তি হলো ৮০টি বেত্রাঘাত করা। মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রথম আয়াত হলো:

“লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন এ দুটির মধ্যে রয়েছে বড় গুনাহ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও রয়েছে। তবে এর পাপ উপকারের অনেক বেশি।” (সুরা আল বাকারা: ২১৯)

মদ ও জুয়া সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত হলো:

“হে মুমিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছে যেও না।” (সুরা আন নিসা: ৪৩)

এ সম্পর্কে তৃতীয় আয়াত হলো:

“হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, তোমরা যাতে সফলকাম হতে পার।” (সুরা আল মায়িদাহ: ৯০)

মদ ও জুয়ার মাধ্যমে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়। আর আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে চায়। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?" (সুরা আল মায়িদাহ: ৯১)

যিনা-ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা:

ইসলামী পরিভাষায় নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন সম্ভোগকে যিনা বা ব্যভিচার বলে। যিনা করা মহাপাপ, কবিরা গুনাহ। যিনার শাস্তি ভয়াবহ। যিনা হতে পারে এমন জিনিসের কাছে যাওয়াও নিষেধ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমরা যিনা বা ব্যভিচারের নিকটবর্তঢর হইও না। কেননা তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট কাজ এবং ঘৃণিত পন্থা।" (সুরা বনী ইসরাঈল: ৩২)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

"তোমরা অশ্লীল কাজের (যিনার) নিকটবর্তীও হইও না, যা প্রকাশ পায় এবং গোপন থাকে।" (সুরা আল আনআম: ১৫১)

অবিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে তার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"ব্যাভিচারিণী ও ব্যাভিচ্রী তাদের প্রত্যেকে একশটি করে বেত্রাঘাত কর।" (সুরা নূর: ২)

বিবাহিত ব্যক্তি যিনা করলে তার শাস্তি রজম বা পাথর মেরে হত্যা করা। হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত নারীর সাথে যিনা করলে তাদের শাস্তি 'একশ' বেত্রাঘাত। অতঃপর রজম। (সহিহ বুখারী)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, বিছানা যার সন্তান তার (পিতার)। আর ব্যাভিচারীর শাস্তি পাথর (রজম করা)।

সুদ/দাদন দেওয়া ও নেওয়া থেকে বিরত থাকা:

সুদের ব্যাপারে প্রথম আয়াত নবুয়তের ৫ম বর্ষে অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা সম্পদ বৃদ্ধি করেনা। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক, তাহাই প্রকৃত বৃদ্ধি পায়।" (সুরা আর রূম: ৩৯)

সুদের ব্যাপারে দ্বিতীয় আয়াত হিজরতের পরে ১-৪ হিজরী সনের মধ্যে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর তাদের সূদ গ্রহণের জন্যে, যদিও উহা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।” (হালাল সব তাদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি) (সুরা আন নিসা: ১৬০)

সুদ নেওয়া, দেওয়া ও সাক্ষী হওয়া হারাম। তৃতীয় পর্যায়ে আল্লাহ সুদকে চূড়ান্তভাবে হারাম করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।” (সুরা আল বাকারা: ২৭৫)

আল্লাহ তাআলা সুদকে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন আর দান-সাদাকাহকে বৃদ্ধি করে দেন।” (সুরা আল বাকারা: ২৭৬)

সুদখোররা কিয়ামত দিবসে পাগলের ন্যায় উঠবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“যারা সুদ খায়, তারা (মাথা উঁচু করে) দাড়াতে পারবে না, (দাড়ালেও) তার দাড়ানো হবে সে ব্যক্তিে মতো যাকে শয়তান নিজস্ব স্পর্শ দিয়ে দুনিয়ার লোভ-লালসায় মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।” (সুরা আল বাকারা: ২৭৫)

চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নেওয়া এবং খাওয়া হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেও না।” (সুরা আলে ইমরান: ১৩০)

আল্লাহ বকেয়া সুদ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বকেয়া যাবতীয় সুদ ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।” (সুরা আল বাকারা: ২৭৮)

ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া থেকে বিরত থাকা:

ঘুষ দেওয়া ও নেয়া হারাম। ঘুষের মাধ্যমে বেধ্য জিনিসকে অবৈধ এবং অবৈধ জিনিসকে বৈধ বানিয়ে দেওয়া হয় এবং অন্যের হক নষ্ট করা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে ঘুষ হিসেবে প্রদান কর না।” (সুরা আল বাকারা: ১৮৮)

কথা ও কাজে অহংকার না করা:

অহংকার একটি গর্হিত কবিরাহ গুনাহ। অহংকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। নিজেকে বড় মনে করা, অপরকে নিজের তুলনায় তুচ্ছ মনে করা, খাটো করা, আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে ঔদ্ব্যত্ব প্রকাশ করা তার প্রতি াবাধ্য হওয়া ও আদেশ অমান্য করা অহংকারের লক্ষণ ও তার আওতাভুক্ত। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় অহংকারের নিন্দা ও অহংকারীর প্রতি ধিক্কার ঘোষিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“মুসা আ. বললেন: আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে, যে হিসাবের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।” (সুরা আল মুমিনুন: ২৭)

আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেনা।” (সুরা আন নাহল: ২৩)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

“আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, সকলেই সিজদা করল, একমাত্র ইবলিশ ব্যতীত। সে অস্বীকার ও অহংকার করল। সে কাফেরদের অন্তর্ভক্ত হয়ে গেল।” (সুরা আল বাকারা: ৩৪)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

“মানুষের প্রতি মুখ ভেংচি দিও না, ভ্রুকুটি কর না এবং জমিনের উপর অহংকার ভরে চলাফেরা কর না। আল্লাহ কোনো গর্ব-অহংকারী লোককে পছন্দ করেন না।” (সুরা লোকমান: ১৮)

অহংকার আল্লাহর চাদর। হাদিছে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, অহংকার আমার পোশাক। যে এ পোশাক কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।” (সহিহ মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন: অহংকার হলো আমার চাদর। সুতরাং যে ব্যক্তি তা নিয়ে টানাটানি (অর্থাৎ অহংকার) করবে, আমি তার গর্দান ছিঁড়ে ফেলব। (সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিজি)

যে ব্যক্তি অহংকার করে সে সর্বদা লাঞ্চিত হয়। হযরত উমার রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ তাকে লাঞ্চিত করেন। সে ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে ছোট ও নিকৃষ্ট অথচ (মনে মনে) নিজেকে অহৈশ বড় মনে করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত মানুষের চোখে সে কুকুর ও শুকরের চেয়ে অধিক ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। (বায়হাকি, মিশকাতুল মাসাবিহ)

মতবিরোধ ও দলাদলিতে লিপ্ত না হওয়া:

মতবিরোধ ও দরাদলিতে লিপ্ত হলে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। আল্লাহ তাআলা মতপার্থক্য না করে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন করার আদেম করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হইও না।” (সুরা আল বাকারা: ১৭৬)

মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া:

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া গর্হিত অপরাধ ও কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“(মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো) তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।” (সুরা আল ফোরকান: ৭২)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন যে, নবী কারীম সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো হাকিমের আদালতে বন্দি থাকা অবস্থায় মিথ্যা কসম খায়, সে যেন আর আবাসস্থল জাহান্নামে, বানিয়ে নেয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিছ নং– ৩২২৭)

রাসুল সা. বলেনঃ

হযরত সাঈদ ইবনে আবি উবায়দা রা. থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদা হযরত উমার রা. জনৈক ব্যক্তিকে কাবার নামে শপথ করতে শুনে তাকে বললেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছিঃ যেু ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম খেল, সে যেন (আল্লাহর) সঙ্গে শরিক করল। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিছ নং– ৩২৩৬)

মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা আসলে ৪টি বড় গুনাহে লিপ্ত হয়। প্রথমত- সে মিথ্যা ও মনগড়া কথা বলে, দ্বিতীয়ত- সে যার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তার উপর জুলুম করে। তৃতীয়ত- সে যার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তার উপরও জুলুম করে। কেননা সে তার জন্য হারাম সম্পদ ভোগের ব্যবস্থা করে দেয়। চতুর্থত- সে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে একটি নিষিদ্ধ সম্পদ, প্রাণ বা সম্ভ্রমের উপর অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ বানিয়ে দেয়।

মহানবী সা. বলেনঃ

জঘন্যতম কবিরাহ গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরিক করা মাতাপিতাকে কষ্ট দেওয়া, আর সাবধান, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সহিহ তিরমিজি)

বিদ্রোহ না করাঃ

মুসলিম সমাজে বিদ্রোহ করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে , যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে বেড়ায়। যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।” (সুরা আশ শুরাঃ ৪২)

ওাসুল সা. বলেছেনঃ বিদ্রোহ ও ঔদ্বত্যের মতো এমন অপরাধ আর নেই যা আখিরাতের আজাব ছাড়াও দুনিয়াতেও আজাব অনিবার্য করে তোলে। (জামি তিরমিজি ও সুনানে ইবনে মাজাহ)

ইয়াতিম ও অন্যের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল ও ভোগ না করাঃ

ইয়াতিম ও অন্যের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল ও ভোগ করা শক্ত অপরাধ ও কবিরাহ গুনাহ। ইয়াতিমের হক আদায় করনা ফরজ এবং ইয়াতিমের উত্তম সম্পদের সাথে নিজের াপবিত্র কিংবা নিম্নমানের সম্পদ মিশিয়ে ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“আর তোমরা এতিমদের ধন-সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দাও এবং অপবিত্র ও খারাপ সম্পদকে পবিত্র ও ভাল সম্পদ দ্বারা পরিবর্তন কর না এবং তাদের সম্পদকে তোমাদের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে ভক্ষণ কর না। নিশ্চয়ই এটা বড় গুনাহ।” (সুরা আন নিসা: ০২)

ইয়াতিমের সম্পদ খাওয়া আর আগুন কাওয়া সমান। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“নিশ্চয়ই যারা ইয়াতিমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা মূলত তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে, আর াচিওেন তারা প্রজ্জলিত আগুনে প্রবেশ করবে।” (সুরা আন নিসা: ১০)

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করা:

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রনা দিয়ে বিপদগামী করে। শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কুমন্ত্রনা থেকে বেঁচে থাকার এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বেঁচে থাকতে আদেশ করেছেন। শয়তানের অনুসরণ করা আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের শামিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” (সুরা আল বাকারা: ২০৮)

আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন:

“আর আমি আশ্রয় চাই ঐ শয়তান থেকে যে বারবার ফিরে আসে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রনা দেয়। (আর এ শয়তান) মানুষ ও জ্বীনের মধ্য থেকে।” (সুরা নাস: ৪-৬)

লোভ-লালসা পরিহার করে চলা:

লোভ-লালসা মানুষকে অবৈধ পথে উপার্জন এ ধাবিত করে। অল্পে তুষ্টি হলো ধনাঢ্যতা। লোভ মানুষের একটি স্বাভাবিক ঝোঁক। মানুষের মন সংকীর্ণতা ও লালসার প্রতি দ্রট্টু আসক্ত ও ধাবিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মার সাথে লোভের উপস্থিতি রয়েছে। (সুরা আন নিসা: ১২৮)

“যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাউকে অপর কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কর না। (সুরা আন নিসা: ৩২)

ঘযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি, বনি আদমের চাহিদা কেবল ছাই দিয়ে পূরণ করা সম্ভব। তার যদি পাহাড় পরিমাণ সম্পদ থাকে তবে সে আরও সম্পদ চাইবে। বনি আদমের চাহিদা ছাই ছাড়া আর অন্য কিছু দিয়ে মেটানোর সম্ভব নয়। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং−৬৪৩৭)

ষড়যন্ত্রমূলক কাজে সম্পৃক্ত না হওয়াঃ

যে কোনো ভালো, সৎ ও মারুফ কাজের উদ্যোগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা ও তা নস্যাৎ করার জন্য চক্রান্ত করা ইষলামের দৃষ্টিতে অবৈধ ও হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"তাদের বেশি বেশি গোপন ও ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠকে কোনো কল্যাণ নেই। তবে যে বৈঠকে সাদাকা প্রদান অথবা ভালো কাজের আদেশ পদান করা হয়, তা ব্যতীত।" (সুরা আন নিসাঃ ১১৪)

আত্মহত্যা না করাঃ

নিজেকে নিজে হত্যা করা হলো আত্মহত্যা। যেমন– বিষ পান, গলায় ফাস, ইচ্ছাকৃতভাবে রেল বা গাড়ির নিচে পড়া কিংবা পাহাড় বা ছাদের উপর থেকে লাফ দেওয়া, বন্দুক কিংবা অন্য কোন ধারাল ছুরি বা অস্ত্র দ্বারা স্বহস্তে নিজেকে খুন করা ইত্যাদি।

আত্মহত্যা করা নিষেধ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"আর তোমরা নিজেদের হত্যা কর না।" (সুরা আন নিসাঃ ২৯)

নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া নিষেধ। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ কর না।" (সুরা আল বাকারাঃ ১৯৫)

অযথা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকাঃ

অযথা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা ইমানদারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেহুদা কথা ও কাজ মানুষের ওজন ও ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"আর (তারাই মুমিন) যারা অযথা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে।" (সুরা আল মুমিনুনঃ ০৩)

মূর্খ লোকের আহ্বান সতর্কভাবে এড়িয়ে যাওয়া উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"আর যখন মূর্খ লোকেরা কোনো বিষয়ে আহ্বান করে তখন তারা বলেন সালাম অর্থাৎ সালামের সাথে তার আহ্বান বর্জন করে।" (সুরা আল ফুরকানঃ ৬৩)

মিথ্যা শপথ থেকে বিরত থাকাঃ

মিথ্যা শপথ করা কবিরাহ গুনাহ। মিথ্যা শপথের মাধ্যমে অন্যের হক্ব নষ্ট করা হয়। তাই মিথ্যা শপথ বড় জুলুম। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নামে ওয়াদা করে ও কসম খেয়ে তার বিনিময়ে ক্ষুদ্র স্বার্থ লাভ করে, আখেরাতে তাদের কিছুই প্রাপ্য থাকবে না, আল্লাহ তাদের সাথে কথা বললেন না, তাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। অধিকন্তু তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" (সুরা আলে ইমরানঃ ৭৭)

ঘযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিতঃ রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য নয় জেনেও কোনো সম্পত্তির দাবিতে শপথ করে, সে আল্লাহকে রাগান্বিত অবস্থায় দেখতে পাবে।

জাদু-টুনা থেকে বিরত থাকা:

জাদু-টুনা ও ভেলকিবাজির মাধ্যমে মানুষের সমূহ ক্ষতি সাধন করা হয়। ইহা কবিরাহ গুনাহ। অভিশপ্ত শয়তানের মানুষকে জাদু শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা। জাদুকরের শরিয়ত বিহিত শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। বর্তমান ইরাক ব্যবিলন শহরে হারুত ও মারুত নামক দুজন ফিরিশতার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তারা উভয়ে কাউকে জাদু শিক্ষা দেওয়ার আগে এ কথা বলে দিত যে, আমরাতো পরীক্ষাসরূপ। কাজেই তোমরা কুফুরিতে লিপ্ত হইও না। তারপর তাদের কাছে লোকেরা এমন জাদু শিখত, যা দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়্য। অথচ তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পার ত না। তারা যে জাদু শিখত তা তাদের শুধু ক্ষতি করত, উপকার করত না। আর তারা এও জানতযে, যে ব্যক্তি জাদু আয়ত্ত করবে, আখিরাতে তার কোনো অংশ প্রাপ্য নেই।" (সুরা আল বাকারা: ১০২)

রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা এবং খোটা প্রদান থেকে বিরত থাকা:

রিয়া বা অন্যকে দেখানোর জন্য সৎ কাজ করা কবিরাহ গুনাহ। রিয়া মুনাফিকির বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তারা মানুষকে দেখায় এবং আল্লাহকে কদাচিৎ স্মরণ করে।" (সুরা আন নিসা: ১৪২)

রিয়া হলো মিরক এবং তার জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"সেই সব নামাজির জন্য ধ্বংস, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে এবং মানুষকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে অস্বীকার করে।" (সুরা আল মাউন: ৪-৭)

খোটা প্রদানের কারনে ব্যক্তির সাদাকা ও দান নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে মুমিনগণ! তেমরা ঐ ব্যক্তির ন্যায় খোঁটা প্রদান করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের সাদাকাগুলো নষ্ট কর না, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তার সম্পদ ব্যয় করে।" (সুরা আল বাকারা: ২৬৪)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের আশা করে, তার সৎকাজ করা উচিত এবং নিজের রবের ইবাদতে কাউকে শরিক করা উচিত নয় অর্থাৎ অন্যকে দেখিয়ে খুশি করার উদ্দেশ্যে ইবাদাত করা উচিত নয়।" (সুরা আল কাহাফ: ১১০)

ঝগড়া-ফাসাদ ও গালিগালাজ না করা:

ঝগড়া ফাসাদ ও গালিগালাজের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়, শত্রুতা সৃষ্টি হয় ও বৃদ্ধি পায়। অশ্লীল বাক্য ব্যবাহরের পরিমাণ অত্যাল্প ভয়াবহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“পিছনে ও সামনে প্রত্যেক পরিনিন্দাকারী ও প্রকাশ্য দোষারোপকারীর দুর্ভোগ ও ধ্বংস।” (সুরা আল হুমাযা: ০১)

অশ্লীল গালিগালাজ ও ঝগড়া ফাসাদের শাস্তি ও পরিমাণ সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে:

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি রাসুল সা. কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই বান্দা এমন কিছু কথা বলে যার পরিণাম সম্পর্কে সে চিন্তাও করেনা। অথচ এ কথা বল্‌র কারনে সে জাহান্নামের এমন গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে যার দূরত্ব মাশরিক ও মাগরিবের দূরত্বের চেয়েও অধিক। (সহিহ বুখারি: ৬০৩৩)

ঝগড়া-ফাসাদ ও গালিগালাজকারী অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তি। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেছেন, মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যার অশালীন ও খারাপ আচরন থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে বা তার থেকে দূরে থাকে। (সহিহ বুখারি: ৫৭০১)

ঝগড়াটে ব্যক্তি সর্বাধিক নিকৃষ্ট। হাদিসে বলা হয়েছে:

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত: রাসুল সা. বলেছেন, আল্লাহর নিকট অতিরিক্ত ঝগড়াটে ব্যক্তি সর্বাধিক নিকৃষ্ট। (সহিহ বুখারি: ৪১৬৯)

হিংসা না করা:

হিংসা একটি মানবিক দুর্বলতা ও অসৎ গুণ। অন্যের ভালোতে কষ্ট অনুভব করা, তার ধ্বংস কামনা করা ও ধ্বংস হলে আনন্দিত হওয়া , এগুলেআই হিংসা।

হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া জরুরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“আর (তুমি বল, আমি আশ্রয় চাই) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হেিংসা করে।” (সুরা আল ফালাক: ০৫)

ইহুদিরা রাসুল সা. কে হিংসা করত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“নাকি আল্লাহ তাআলা যা কিছু তাঁকে স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য তারা মানুষের সাথে হিংসা করে।” (সুরা আন নিসা: ৫৪)

স্বল্প জ্ঞানীরাই হিংসা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“অতঃপর অচিওেন তারা বলবে, বরং তোমরা তোমাদের প্রভু হিংসা পোষণ করছ। বরং তারা খুব কমই বুঝে।” (সুরা আল ফাতাহ: ১৫)

ডহংসা আগুনের মতোই নেক আমলকে জালিয়ে দেয়। হাদিসে বলা হয়েছে:

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিতঃ রাসুল সা. বলেছেনঃ তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থঠশ। কেননা হিংসা নেক আমল এমনভাবে খেয়ে ফেলে (ধ্বংস করে দেয়) যেমনভাবে আগুন কাঠখন্ডকে খেয়ে ফেলে (অর্থাৎ জ্বালিয়ে দেয়) । (সুনানে আবু দাউদ-মেশকাতুল মাসাবিহ)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিতঃ রাসুল সা. বলেছেন, আর তোমরা পরস্পর হিংসা কর না। (সহিহ বুখারীঃ ৫৬৩৮)

জেনে-শুনে সত্য গোপন করা

জেনে শুনে সত্য গোপন করা কবিরাহ গুনাহ বা মহাপাপ।

আল্লাহ আতালা আল কোরআনে বলেনঃ

"আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ কর না , আর জেনেশুনে সত্যকে গোপন কর না।" (সুরা আল বাকারাঃ ৪২)

সত্য গোপনকারী বড় জালিমবা অত্যাচারী। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর জালিম বা অত্যাচারী কে হতে পারে? যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে থাকা কোনো সাক্ষ্য গোপন রাখে।" (সুরা আল বাকারাঃ ১৪০)

কৃপণতা, অপচয় ও অপব্যয় পরিহার করাঃ

আবশ্যকীয় ব্যয় করতে অনীহাকে কৃপণতা বলে। কৃপনতা করা হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"আর তোমার হাত কাঁধের সাথে বেঁধে রেখোনা। অর্থাৎ কৃপণতা কর না।" (সুরা বনী ইসরাঈলঃ ২৯)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

যারা আল্লাহর দেয়া সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করে, তারা যেন মনে না করে যে, এই কাপর্ণ্য, তারা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।" (আলে ইমরানঃ ১৮০)

আল কোরআনে আরও বলা হয়েছেঃ

"আর যারা কৃপণতা করে এবং মানুষদেরকে কৃপণতার আদেশ দেয় এবং আল্লাহ তাআলা তার অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দান করেছেন, তা গোপন করে আর কাফেরদের জন্য আমরা অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।" (সুরা আন নিসাঃ ৩৭)

অর্থ সম্পদ অযথা নষ্ট করা অপচয়। অপচয় করা হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"আর তোমরা অপচয় করা না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।" (সুরা আরাফঃ ৩১)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা অপব্যয়। অপব্যয় করাও হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর তোমার হাতকে পূরোপুরি বিস্তৃত করে দিও না, তাহলে তুমি অনেক নিন্দিত, ধিকৃত ও দরিদ্র হয়ে পড়বে।" (সুরা বনী ইসরাঈল: ২৯)

আল্লাহ তাআলা আল কোরআনের আরেক জায়গায় বলেন:

"আর অপব্যয় কর না, কোনরূপ অপব্যয়। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুকে অস্বীকারকারী।" (সুরা বনী ইসরাঈল: ২৬-২৭)

তোষামোদ পরিহার করা:

তোষামোদ মানবচরিত্র এর অত্যৗল্প খারাপ বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে ব্যক্তি অন্যকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজের প্রাপ্যের অতিরিক্ত আদায় করে না। রাসুল সা. বলেন–

ঘযরত আবু মা'মার রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আমিরগণের সদ্যে থেকে কোন একজনের প্রশংসা করছিলেন, আর মিকদাদ তার উপর বালি নিক্ষেপ করা শুরু করলেন এবং বললেন- আল্লাহর নবী রাসুল সা. আমাদেরকে আদেশ করে বলেন- আমরা যেন অতিরিক্ত প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করি। (সহিহ মুসলিম হাদিস নং- ৭১৪২)

মৃত্যুর সময় যেসব লক্ষণ মুমিনের জন্য সুসংবাদ

জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যু অনিবার্য। প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কোনো প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের সুরা আলে ইমরানের ১৮৫ নম্বর আয়াতে বলেন, "সব প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। কেয়ামতের দিন তাদের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জানআতে প্রবেশ করানো হবে; তারাই সফল। আর দুনিয়ার জীবন ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।"

আল্লাহ তাআলা সফল ব্যক্তিকে জানআত আর পাপী ব্যক্তিকে জাহান্নামে পাঠাবেন। মুমিন ব্যক্তির কিছু লক্ষণ তার মৃত্যুর সময় ফুটে ওঠে। নেককার ব্যক্তির এমন কিছু লক্ষণ আছে যা মৃত্যুর মুহূর্তের অনেকেরই পরিলক্ষিত হয়। নবীজী সা. সে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সেগুলো হলো:

কালেমা পড়া:

মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর মুহূর্তের শেষ কথা হবে কালেমা। রাসুল সা. বলেন, যার শেষ কথা হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সে জানআতে প্রবেশ করবে।

কপালে ঘাম হওয়া:

মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হয়। রাসুল সা. বলেন, “মুমিনের মৃত্যুতে কপালে ঘাম বের বের হবে।” বুরাইদ বিন হাছির রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী কারীম সা. কে বরতে শুনেছি “মুমিন ব্যক্তি কপালে ঘাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।” (মুসনাদে আহমদ, তিরমিজি)

জুমার রাত-দিন মৃত্যুবরণঃ

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে জুমার দিন অর্থাৎ শুক্রবার সূর্যাস্তের আগে মৃত্যু হওয়া। যে মুসলিম ব্যক্তি জুমার দিন বা রাতে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাকে কবরে বিপদ থেকে হেফাজত করেন। নবী কারীম সা. বলেন, “যে ব্যক্তি জুমার রাতে বা দিনে মৃত্যুবরণ করেন আল্লাহ তাকে কবরের আজাব থেকে নাজাত দেন।” (মুসনাদে আহমদ, তিরমিজি)

শহিদের মৃত্যুঃ

ধর্মের (ইসলাম) জন্য জীবন দেয়া মুমিনের অন্যতম লক্ষণ। যারা ইসলামের জন্য জীবন দিয়েছে কোরআনে তাদের মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, “কবরে তারা রিজিকপ্রাপ্ত হয়।”

সীমান্ত রক্ষায় মৃত্যুঃ

দেশের সীমান্ত পাহারার দ্বায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা সৈনিক এর মৃত্যু উত্তম মৃত্যু হিসেবে গণ্য। রাসুলে আকরাম সা. বলেন. একদিন বা একরাত সীমান্ত পাহারা দেয়ার মর্যাদা এক মাস রোজা রাখা এবং এক মাস দাড়িয়ে ইবাদাত করা থেকে উত্তম।

নেক আমলরত অবস্থায় মৃত্যুঃ

নেক আমলরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা উত্তম লক্ষণ। তা হতে পারে মানুষের যে কোনো ভালো কাজ। অর্থাৎ মৃত্যুর আগ মুহূর্তে কালেমার তেলওয়াত, রোজা পালন, দান-সাদকা করা, ন্যায় কথা বলা, ইবাদত বন্দেডসতে নিয়োজিত থাকা ইত্যাদি।

অত্যাচারী কর্তৃক হত্যাঃ

অন্যায়ভাবে কিংবা মিথ্যা দোষী সাব্যস্ত করে কিংবা জোরপূর্বক কাউকে অত্যাচার নির্যাতন করে হত্যা করা হলে সে মৃত্যু উত্তম মৃত্যুর লক্ষণ। এমন মৃত্যুর উদাহরণ হলোঃ হযরত হামজা ইবনে আবদুল মুতালিবের রা. মৃত্যু। তাকে মক্কার অত্যাচরী নেতারা যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করেছিল। হত্যা করার পরও তার ওপর নির্যাতন করেছিল।

মোটকথা, মুমিন আল্লাহর জমীনে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আগত মানব জাতিকে এ দায়িত্ব পালনে সহায়তা দানের দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিয়োজিত একজন সৈনিক। আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহরে দ্বীনের ভিত্তিতে গোটা মানব জাতিকে কল্যানের পথ দেখানো, অকল্যাণের পথ থেকে ফিরানো– অন্য কথায় দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি লাভের পথ দেখানো তাদের প্রধানতম কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“এভাবে তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মতরূপে গড়া হয়েছে। যাতে তোমরা সকল মানব জাতির জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হলো আল্লাহর রাসুল।” (সুরা আল বাকারা ১৪৩)

অর্থাৎ আমাদের জীবন-জিন্দেগীর সকল ক্ষেত্রে রাসুল সা. কেই যদি আমরা অনুসরণ করি, তাঁকেই আমরা আদর্শ হিসেবে মেনে চলি, তাহলে তার ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার সকল মানুষ আমাদেরকে আদর্শ হিসেবে মেনে চলবে। এভাবে রাসুলের আদর্শের পতাকাবাহী হিসেবে মানব জাতিকে পথ দেখানো, মানুষের সমাজে সত্যিকারের মানবতা ও মনুষ্যতের বিকাশ ঘটানোই আল্লাহর সৈনিক হিসেবে মুসলিম উম্মাহর একমাত্র মিশন। আল্লাহর রাসুলের সরাসরি গড়া লোকদের পরিচয় ছিল তারা রাতে দরবেশ এবং দিনে অশ্বারোহী যোদ্ধা।

আল্লাহ আবর মুমিনদেরকে গেন জিহাদী জিন্দেগী ফিরে পাবার তাওফিক দিন। আমীন।